প্রেম ও শান্তি।

প্রেম—আত্মবিসর্জ্জন।

"দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"

গীতা—শ্রীভগবদুক্তি

প্রেম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"তুমি আমায় চাও, না—তোমার ভগবান্‌কে চাও ?"

"কি বলিব ?"

"সত্য যা, তাই বল।"

"আমি দুই-ই চাই।"

তা হয় না, প্রিয়তম !"

"কেন হয় না প্রিয়তমে ? তুমি মনে করিলে সকলই মানাইয়া লইতে পার। আমার মাথা খাও মোহিনি,—আর আমাকে লইয়া খেলাইও না।"

"আমি খেলাইলাম ?—আমায় এ অন্যায় অপবাদ দিতেছ।"

"অন্যায় নয়, ন্যায় ;—তুমি মনে করিলে সকলই করিতে পার।"

এবার মোহিনী একটু হাসিল। তারপর গম্ভীর হইয়া বলিল, "কেবল ধর্ম্ম পারি না।"

"সে আবার কি ?"

"দেখ, এ বৈষয়িক কাজ নয় যে, ছুট-ফাঁক বাদ দেওয়া চলিবে। এ ধর্ম্মের দোর,—চুল চিরিয়া এর বিচার হয়।"

এবার কথাটা গিয়া, যুবক মন্মথর মর্ম্মে মর্ম্মে বিঁধিল,—'এ ধর্ম্মের দোর,—চুল চিরিয়া এর বিচার হয়।' সুতরাং তিনি নিরুত্তর,—অধোবদনে একটি নিশ্বাস ফেলিলেন মাত্র।

মোহিনী আবার বলিল, "যদি আমায় না চাও, আর আমার কাছে আসিও না,—আমার গায়ের বাতাস লইও না,—রমণীর রূপের চিন্তা অবধি করিও না,—তোমার ভগবান্‌কে লইয়া থাক।"

"কিন্তু—"

"না ভাই, এর আর 'কিন্তু টিন্তু' নাই। যে দিক্ হোক, এক দিক্ ধরো,—দু-নৌকয় পা দিয়ে কোন কাজ হয় না।"

সাক্ষাৎ মায়া-রঙ্গিণী,—ভোগ ও লালসার মূর্ত্তিমতী ছবি,—নীটোল যৌবনের রূপের তরঙ্গ সর্ব্বাঙ্গ দিয়া তর তর বেগে বহিতেছে,—ঈষৎ কম্পিত অধরে হাস্য-মাধুরী থাকিয়া থাকিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে,—চকিতচঞ্চল দুটি চক্ষে কাম-কটাক্ষ যেন অবিচ্ছিন্নরূপে মিশিয়াই রহিয়াছে,—সেই প্রবৃত্তি-ক্ষুধার অতি উপাদেয় খাদ্য—যেরূপ উপযাচিকা হইয়া হাসি-হাসি মুখে কথা পাড়িল, যে ভাবে মধুরতম 'ভাই' সম্বোধন করিল, তাহাতে ক্ষুধাতুর

রূপের কাঙ্গাল—পরন্তু প্রবল ঈশ্বরবিশ্বাসী কর্ম্মফল-বাদী যুবক—কি উত্তর দিবে, কিছুই ভাবিয়া পাইল না। তাই 'কিন্তু' বলিয়া, কি উত্তর দিতে যাইয়া বাধা পাইল। যে বাধা পাইল, ভাবিয়া দেখিল, তাহাও ঠিক্। পরন্তু মন তাহাতে প্রবোধ মানিল না। তাই আবার কিছুক্ষণ তর্ক বা কথা-কাটাকাটি করিতে প্রবৃত্ত হইল।

যুবক বলিল, "যদি পরকাল না থাকিত,—এই খানেই এ জীবন শেষ হইত, তাহা হইলে মোহিনি, তোমায় বুকে লইয়া, সংসারে নন্দন-কানন রচনা করিতে পারিতাম। কিন্তু—"

এবার মোহিনী বা সেই মায়াবিনী—পরিধেয় সূক্ষ্ম বসনাঞ্চল—অকারণে শূন্যে একটু দোলাইল, তার পর যেন অসাবধানে বুকের বসন একটু সরিয়া পড়িল—এইরূপ ভাণ করিয়া—তখনি আবার তাহা যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়া কহিল, "'যদি', 'যেমন', 'কিন্তু'—এ সব লইয়া কি প্রেম হয় প্রাণাধিক ?"

আবার সেই প্রাণ-মাতানো মধুর হাসি, এবং সেই হাস্যের সঙ্গে সঙ্গে আবার যেন অসাবধানে বক্ষের বসন ঈষৎ স্খলিত হওন।—এবার আবার কবরীভ্রষ্ট সুচিক্কণ সুদীর্ঘ কেশদাম—সহসা পৃষ্ঠ-দেশে এলাইয়া পড়িল।—অপরূপ শোভা হইল।

মন্ত্রমুগ্ধ যুবক ভাবিল, "আ মরি মরি! কোন্ চিত্রকর এ চিত্র আঁকিল রে!—এই-ই স্বর্গের ছবি, আবার এই-ই নরক-দ্বার! এই-ই সঞ্জীবন-সুধা, আবার এই-ই বিষবল্লরী!—ভগবান্, তোমার এ সৃষ্টি কি? হায়, রমণীর রূপ! এত রূপেও তুমি মানুষকে মজাও!"

ব্যক্ত প্রেমের অভিনয়। এবার আর সে গুপ্ত-প্রেমের নায়ক নায়িকা 'অতুল' বা 'সুন্দরী' নয়,—এবার সব খোলাখুলি, সবই স্পষ্টাস্পষ্টি।—মোহিনী হাসিয়া বলিল, "কি ভাবিতেছ? যা হোক্ একটা উত্তর দাও?—আমিও সরিয়া পড়ি,—তুমিও তোমার পথ দেখ।"

মন্মথ একটা গভীর মর্ম্মচ্ছেদকর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কি বলিব ?"

অম্লানবদনে পাপিষ্ঠা মোহিনী বলিল, "যদি আমায় চাও,—ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ইহকাল, পরকাল, সমাজ, সংসার—সকলই বিস্মৃত হও। তোমার ভগবান্‌কেও কর্ম্মনাশার জলে নিক্ষেপ কর।"

যুবক কি ভাবিল। একটু দৃঢ়তার সহিত কহিল,—"না, তা পারিব না। জীবনে যখন একবার সে অমৃতের আস্বাদ পাইয়াছি,—তখন কিছুতেই তাহা পারিব না।"

মোহিনী। পারিবে না ? তবে, আমি যাই ? আমার আশা চিরদিনের মত ত্যাগ কর ?

মন্মথ। না, তাও ত্যাগ করিতে পারিব না—তুমিই আমার অমৃত, তুমিই আমার বিষ। তুমিই আমার সাধনা. তুমিই আমার সিদ্ধি!—তোমার ঐ জ্যোতির্ম্ময় রূপের ভিতর দিয়া আমি সেই অনন্ত রূপসাগরে মিশিব।

মোহিনী। যদি এতই জানো, তবে আবার মাঝে মাঝে ঢং কর কেন? আধ্যাত্মিকতা আনিয়া, ভক্তির প্রসঙ্গ তুলিয়া, হাবুডুবু খাও কেন?

মন্মথ। কেন,—তোমায় কি বলিব মোহিনী? তুমি ত তখন রূপের মন্দিরে আপনার আরাধ্য দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত কর নাই? তুমি ত আজীবন রূপের তপস্যা করিয়া, জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণে, সেই সর্ব্বরূপের আকর—সেই পরমপুরুষের সত্ত্বা—চকিতের মত একবার—একবারমাত্র হৃদয়ে উপলব্ধি কর নাই? যদি তা করিতে, ত বুঝিতে, কি বিষম জ্বলন্ত আগুনে আমি দিবারাত্র দগ্ধ হইতেছি!—হায়! সেই রূপ—কখন জননীরূপে, কখন জায়ারূপে, কখন কন্যারূপে,—আমার মানস-চক্ষে ভাসমান। কিন্তু তাহা ঐ কল্পনা পর্য্যন্ত। প্রত্যক্ষ, ইন্দ্রিয়ভূত—আমার জীবনসর্ব্বস্ব তুমি,—হে চিরবাঞ্ছিতে পরকীয়া প্রমত্তা কামিনি,—তোমার এই অপরূপ রূপ আমার অন্তরের অন্তরে চিত্রিত!—জাননা প্রাণাধিকে,

আমার প্রাণে তাহা কি তুমুল সংগ্রামের সৃষ্টি করিয়াছে! মনে মনে ক্ষতবিক্ষত হইতেছি, পিপাসায় বুকের কলিজা ফাটিয়া যাইতেছে,—বাঞ্ছিত সুধা তুমি সম্মুখে,—হায়! তোমায় গ্রহণেও সাহসী হইতেছি না। এক হাত অগ্রসর হই, ত কে পাঁচ হাত অন্তরে লইয়া যায়!—হায়! কে আমায় এ সমস্যা বুঝাইবে? কে আমায় প্রকৃতিস্থ করিবে? কে আমার জীবনে শান্তি দিবে?

কুপিতা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া এবার মোহিনী উত্তর দিল,—"সচ্চরিত্র ধনীর সন্তান,—সাধু যুবক! মনে মনে আপন চরিত্রের বড়ায়েই গেলে!—তোমার ভগবান্ আছেন, ধর্ম্ম আছেন, পরকাল আছে,—এ দুঃখিনী বাল-বিধবার এ সব কিছুই নাই—কেমন? সংগ্রাম তুমি একাই করিতেছ,—মনে মনে ক্ষতবিক্ষত তুমি একাই হইতেছ—কি বলো? কতকগুলা কথা শিখিয়া রাখিয়াছ বৈত না?—তাই মনের আবেগ আসিলে যা খুসী বলিয়া

ফেল।—আমাকেই বা তুমি কি মনে কর? সত্যই কি আমি কলঙ্কিনী? আমিও কি সৎপথে চলিতে, এ দুর্দ্দমনীয় চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিতে চেষ্টা পাই না—ভাবো? খুবই চেষ্টা পাই,—খুবই কাঁদি। হায়! কি জানিবে তুমি—সৌভাগ্যক্রোড়ে প্রতিপালিত নবীন যুবক?—বয়সেও আমি তোমার তিন বৎসরের বড়,—কত উপদেশ শুনিয়াছি, কত ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িয়াছি, কত সাধ্বীর চরিত্র আলোচনা করিয়াছি;—কিন্তু কৈ, সংস্কার দূর হইল কোথায়? জানো কি তুমি মন্মথ,—তোমার হাত এড়াইবার জন্য—কতবার আমি জলে ঝাঁপ দিতে গিয়াছি,—আগুনে পড়িতে গিয়াছি,—বিষ খাইতে উদ্যত হইয়াছি! কিন্তু হায়! কেন জানি না, তোমার মুখ মনে পড়িলে,—আমার আর মরা হয় না;—এ দুর্ব্বহ দেহ-ভার বহিতে আবার সাধ যায়! তাই আবার এ দেঁতোর হাসি হাসিয়া তোমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াই!—কিন্তু আর না,—আর আমি

তোমার সম্মুখে আসিয়া তোমার পথের কণ্টক হইব না। এই শেষ বিদায়। তুমি সুখে থাকো,— আমারও নারী-ধর্ম্ম রক্ষা হোক।”

মন্মথ। আমিও সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, তাই হোক।—কিন্তু এ কি! তুমি কাঁদিতেছ? কাঁদিয়া আমার বুকে, কেন শেলনিক্ষেপ কর প্রাণাধিকে? কৈ, আমি ত তোমায় এমন রূঢ় বাক্য কিছু বলি নাই? যাই হোক, মনের অধীরতায় যদিই কোন দুর্ব্বাক্য মুখ দিয়া বাহির হইয়া থাকে,—আমায় ক্ষমা কর। আমি তোমার চির-স্নেহপ্রার্থী অভাগা বাল্যসখা জানিও।

মনে মনে বলিল,“ইহারই নাম মায়ার খেলা:— এই-ই দৈবী মায়া!—হায় মায়ারূপিণী রমণী!”

আবার পরস্পরের সজলনয়নে পরস্পরকে দর্শন। আবার ক্ষুধিত, তৃষিত, চিরপ্রার্থিত, অপূর্ণ প্রেমের নীরব আকিঞ্চন। স্থান—সহরের সন্নিকট একটি ক্ষুদ্র পল্লী,—সেই পল্লীস্থ একটি নির্জ্জন

পুষ্পোদ্যান। সময়—মধুর অপরাহ্ন। ঝির্ ঝির্ করিয়া মধুর বাতাস বহিতেছে। মনের সুখে পিক কুহু-রব করিতেছে। পুষ্পগন্ধে দিক আমোদিত হইয়াছে।

নায়ক-নায়িকার বুক দুরু-দুরু কাঁপিতে লাগিল। মনের মধ্যে হিয়ায় হিয়ায় স্পর্শ হইল। উভয়ের অধর সুধাপানে উভয়েই লোলুপ হইল।—আর কেহ কোথাও নাই।

কিন্তু তখনই আবার সেই অনন্ত রূপময়ের রূপ, সেই প্রেমময়ের মুখ,—সেই ধর্ম্মের কঠোর অনুশাসন—মনে পড়িল। মন্মথ ভাবিল, "যদি একবার ডুবি,—আর উঠিতে পারিব না। কে জানে, এই পতন—শেষপতন হইবে কিনা ?"

মোহিনী পোড়ারমুখী ভাবিল, "যেদিন ইচ্ছা, ত বিষপান করিতে পারিব—দেখি মন্মথ কতদূর অগ্রসর হয়!"

এমন সময় দূরে কে গান গাহিল। বড় মধুর, বড় পবিত্র কণ্ঠে, বড় পবিত্র গান গাহিল,—

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু,
নয়ন না তিরপিত ভেল।"

গান শুনিয়া, গানের এই একটি মাত্র চরণ হৃদয়ঙ্গম করিয়া, যুবকের সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সেই রোমাঞ্চিত দেহে, আর্দ্রহৃদয়ে তিনি আপনা আপনি বলিলেন, "হায়! কোথায় সেই অনন্তের বিশ্ববিমোহন রূপ, আর কোথায় এই ক্ষুদ্র নারীর পরিবর্ত্তনশীল নশ্বর সৌন্দর্য্য! আবার দুই দিন পরে ইহার পরিণাম—চিতাভস্ম-রাশি! তবে এ মোহ কেন?"

গায়ক গাহিতে লাগিল,—

"সোহি মধুর বোল শ্রবণহি শুনমু,
শ্রুতিপথে পরশ না গেল।"

যুবক ভাবিলেন, "সত্য, কোথায় সেই অমিয়স্বর, আর কোথায় এই বায়সীর কণ্ঠ! না, আর আমি এ মোহে মজিব না;—আজ হইতে সেই অনন্ত রূপময়ের রূপ হৃদয়ে ধারণা করিতে চেষ্টা পাইব।"

গায়ক অলক্ষ্যে থাকিয়া পুনরায় আপন সুধাবর্ষী কণ্ঠে গাহিতে লাগিল,—

"কত মধুযামিনী　　　　রভসে গোঁয়াইনু
না বুঝনু কৈছন কেলি।
লাখ লাখ যুগ　　　　হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি।
কত বিদগধ জন　　　　রসে অনুমগন
অনুভব—কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহ　　　　প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলল এক ॥"

অশ্রুসিক্ত মুখে, করুণকণ্ঠে, যুবক বলিলেন, "সত্য, লাখের মধ্যে এমন একজনও ভাগ্যবান্ দেখি না, যে—ভগবানের সহিত বিহার করিয়া পরিতৃপ্ত হয়;—আর মূর্খ আমি,—এই নারীর পঙ্কিল প্রেম-রসে পরিতৃপ্ত হইবার কামনা করিতেছি!—হায় আশা-মরীচিকা!"

সেই নির্জ্জন পুষ্পোদ্যানে নবীন যুবক মন্মথ, মন্মথ-শরে বিদ্ধ হইলেও, সে বাণ উন্মোচনে

সচেষ্ট ;—এই ভক্তিরসাশ্রিত গান শুনিয়া বুকে যেন কিছু বল পাইল। ধীরভাবে নায়িকাকে কহিল, "কেমন মোহিনি, এই কি না ?"

বাণবিদ্ধা কুরঙ্গিণী—লালসাবিহ্বলা কুহকিনী—সে কথার স্পষ্ট কোন উত্তর দিল না,—একটি তপ্তশ্বাস ফেলিয়া, ভূমিপানে মুখ নত করিয়া কহিল, "এখন তবে তুমি কি বলিতে চাও ?"

মন্মথ মনে মনে বলিল, "বটে, এতদূর ? উঃ ! কি কঠিনহৃদয়া রাক্ষসী !—কি কুহকজালেই আমি পড়িয়াছি ! এমন পবিত্র প্রেমপূর্ণ পারমাত্মিক গানেও একটু দ্রব হইল না ?"

নায়ককে নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া পাপিষ্ঠা শ্লেষবাক্যে কহিল,—"একি ! কোন বৈষ্ণব-ভিখিরীর মুখে একটা গান শুনিয়া, 'ভাব' আসিল নাকি ? কৈ, আমার কথার ত কোন উত্তর দিলে না ?"

মন্মথ প্রকৃতই অন্তরে একটা আঘাত পাইল।

ভাবিল,"একি প্রেম,না—প্রেমের বীভৎস অভিনয় ?—ওঃ ! অবিদ্যারূপিণী পরমেশ্বরি !"

যুবক গভীর এক নিশ্বাস ফেলিল। হৃদয়ের কাতরতায়,—রোমাঞ্চিত দেহে, সজলনয়নে আপনা আপনি কহিল, "মায়াময়ী প্রকৃতি ! মা আমার ! তোমার অবিদ্যা বা মায়ার অনন্ত দ্বার ;—দোহাই মহামায়ে ! আমায় আর কোন দ্বার দিয়া পরীক্ষা কর ;—এ দ্বার চিররুদ্ধ করিয়া দাও !—এ কাল ভুজঙ্গীর করাল দংশন হোতে সন্তানকে রক্ষা কর। আমি তোমার শরণাগত,—আমায় ত্রাণ কর জননি !"

নায়ককে তখনো নিরুত্তর অথচ কিছু উন্মনা থাকিতে দেখিয়া—নায়িকা পুনরায় বলিল, "এখন তবে তুমি কি চাও ?—কোন্ পথ ধরিবে ?"

এবার যুবক দৃঢ়তার সহিত উত্তর দিল,—"আমি ভগবান্‌কে চাই,—তাঁর ভক্তি-পথ ধরিব ;—তুমি দূর হও।"

মন্মথ অতি উপেক্ষা ও ঘৃণাভরে—বেগে সে স্থান ত্যাগ করিল।

পাপিষ্ঠা তাহা গায়ে না মাখিয়া, হাসিতে হাসিতে আপন মনে কহিল, "ও রাগ বেশীক্ষণ নয়। আবার আসিয়া আমায় সাধিতে হইবে,—আবার আমার জন্য পাগল হইতে হইবে।—পরাণ-বঁধু, অমন আমি তোমার ঢের দেখিলাম!"

মন্মথ দ্রুত পাদবিক্ষেপে সে পাপস্থান—স্বকর্ম্মার্জ্জিত আপন স্থান ত্যাগ করিয়া—একেবারে সেই অনির্দ্দিষ্ট ভক্তিপ্রাণ গায়কের সম্মুখবর্ত্তী হইলেন। দেখিলেন, গায়ক তাঁহার পরিচিত একটি পাগল। লোকে তাহাকে রামা পাগ্‌লা বলিয়া জানে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সেই রামা পাগ্‌লা, অথবা রামব্রহ্ম ঠাকুর—তাঁহাকে দেখিয়াই—উচ্চমধুর হাসি হাসিয়া কহিলেন, "কি গো বাবু মশাই, পালাইয়া আসিলে কেন?—দিল্লীর লাড্ডুর স্বাদটা একটু নিলে হতো না?"

যুবকের বুকটা যেন দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল,—"এ পাগল আমার গুপ্ত প্রণয়ালাপের বিষয় জানিতে পারিল নাকি? তাই বা বলি কিরূপে? বাগানের ফটক-দ্বার ত বন্ধই আছে?"

পাগল হেঁয়ালি ছন্দে বলিল,—

"ডুবে ডুবে জল-খাওয়ার মন্তোর জানি আমি।
সবাইকে ভাবো বোকা—বড় শিয়ানা তুমি ॥

—কেমন, না?"

যুবক চমকিত, ভীত, একটু সন্ত্রস্থ,—"হায়! এ পাগল বলে কি? না, বোধ হয় খেয়াল—আর কিছু উদ্দেশ করিয়া বলিতেছে।"

পাগল আবার বলিল,

"যা ভাবচ তা নয় গো বাবু,
যা ভাবচ তা নয়।
মৃগনাভির গন্ধ এ যে—
আপনা হোতে বয় ॥"

যুবক নির্ব্বাক্ বিস্মিত হইয়া পাগলের পানে চাহিয়া রহিল।

পাগল এবার একটু নাচিতে নাচিতে, হাতে তালি দিতে দিতে কহিল,

"বলিহারি পিরীতি তুই চোকে মুখে আঁক।
নায়ক নায়িকা তোরে সদা রাখে ঢাকা ॥
ঢাকিলে কি হবে রে ভাই, তুই যে পরশ-মণি।
যে ছুঁয়েছে সে মজেছে, (যেমন) মন্মথ-মোহিনী ॥

—মনের কথা বোলে ফেল্লুম—দ্দূয়ো!"

যুবক। (স্বগত) আর আত্মগোপন বৃথা—একে ধরা দেই। পাগল বটে, কিন্তু বড় সহৃদয়। আহা, কি করুণ দৃষ্টি!

পাগল।—"এখন কি দেবে—তা দাও,
নইলে, হাটের মাঝে ভাঙ্গ্‌বো হাঁড়ী,
(একবার) মুখ তুলে চাও।

—ওকি! অমন কোরে রইলে যে? একবার আমার পানে ভাল কোরে চেয়ে দেখ?"

যুবক। রাম, তোমার গলাটি বড় মিষ্ট,—পাষাণ দ্রবীভূত হয়।"

"বাঃ, বাঃ, বাঃ!—কি কথার কেরামতি রে! ধাঁ কোরে আসল বিষয়টা চাপা দিচ্ছ? আমার

গলা মিষ্টি হোক আর তিত হোক্, সে জন্যে তো তোমার বড় বোয়ে গেল !”

“না, সত্য বোল্‌চি, বড় মিষ্ট।”

“সত্যের জ্ঞান তোমার কতদূর টন্‌টোনে, তাতো তুমি নিজেই জানো ? কেন আর মনকে চোখ ঠেরে ‘ভাবের ঘরে চুরি’ করো ?”

“তুমি আমায় চোর বোল্লে ?”

“চোর—বিষম চোর ! বিষয়ী লোক-মাত্রেই চোর !—কেন তুমি ঐ অবলার ধর্ম্মনষ্ট কোত্তে জাল পেতেছ ? পেটের দায়ে ঘটীবাটী-চোর কি তোমার চেয়ে বেশী দোষী ?”

যুবকের বুক কাঁপিয়া উঠিল,—“ওঃ ! কি ক্ষুর-ধারতুল্য তীক্ষ্ণ বাক্য-বাণ ! কি জ্বালাময় কঠোর সত্য !”

অপরাধীর ন্যায় যুবক ভূমিপানে দৃষ্টি অবনত করিয়া রহিলেন। দুনিয়ার ফকির—একজন পথ-ভিখারী—কাঙ্গাল পাগল,—তাহার নিকট অতুল-

বিভবশালী যুবক কম্পিতকলেবর!—নিষ্পাপ আত্মার প্রভাব এমনই হয়।

পাগলও তাহা বুঝিল। তাই তখনি আবার সহানুভূতির অমৃতশীতল কণ্ঠে বলিল, "এখন বাবুজী, তোমার মনের কথা কি?"

যুবক এবার অতি ধীর বিনীতভাবে, সলজ্জ দৃষ্টিতে কহিল, "কি আর বলিব? অন্তর্য্যামী দেবতার ন্যায় তুমি আমার অন্তরের সকল কথা জানিতে পারিয়াছ,—তোমার নিকট লুকাইব কি?"

"ভয় নি,—আমি গোয়েন্দা নই,—কিংবা ঠগ্ ধড়িবাজ্ পাটোয়ার নই যে, লোকের কাছে তোমার মানহানি কোরে পসার বাড়াবো;—তা ডুব্‌তে গেছেলে যদি, তো ডুবে পাতাল অবধি একবার দেখ্‌লে না কেন?"

"না, আর দেখ্‌বার সাধ নাই।"

"সে কি? সাধ কি কখন পোরে? হাতে পেয়েছ যদি——"

"তুমি কি বোল্‌চো ?"

"পাগলের খেয়াল।—বোল্‌চি, এই মন এখন কিসে দিতে চাও ?"

যুবক নির্ব্বাক্ হইয়া পাগলকে দেখিতে লাগিলেন, পাগল যেন কি গভীর গূঢ় রহস্য তাঁহাকে বুঝাইতে যাইতেছে। মুখখানি হাসিমাখা, দৃষ্টি করুণাপূর্ণ। পুনরায় বলিল, "এখন কি নিয়ে থাক্‌বে ?"

যুবক কি উত্তর দিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না। বস্তুতঃ, কি লইয়া থাকিবেন ?—মন ত চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার নয় ?

পাগল বলিল, "এই এত বড় পৃথিবী,—ভগবানের এই বিশাল কার্য্যক্ষেত্র,—আর কোন দিকে মন দিলে হয় না ?"

"কিসে দিব, তুমি বলিয়া দাও।"

ব্যথিতভাবে সমবেদনা পাইবার আশায়, যুবক—পাগলের পানে চাহিলেন। পাগল কহিল, "জাল গুটাইবে, না, আরো ছড়াইয়া ফেলিবে ?"

যুবক একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "হায় রাম! তোমার এ দুর্থঘটিত শব্দের অর্থ আমি বুঝিতে পারিতেছি না।"

"হাঁ, আমার এ কতকটা হেঁয়ালি বটে।—তা 'রাম' আবার কি,—রামা পাগ্‌লা বলো?"

"যা বোলেচি তা বোলেচি,—আর বোল্‌বো না,—তুমি রামব্রহ্ম ঠাকুর।"

হো হো হাসিতে হাসিতে পাগ্‌লা উত্তর দিল,—"ঠাকুরের পৈতে কৈ?"—'পৈতে পুড়িয়ে ব্রহ্মচারী';—রামা পাগ্‌লা—কুকুর।"

পাগল এমন ভাবে হাসিল, এমন ভাবে কথা কয়টি বলিল যে, তাহাতে বিন্দুমাত্র বিকার বা আত্মাভিমান নাই,—পরন্তু ঐরূপ ভাবে মনোভাব প্রকাশ করিয়া দিব্য আত্মানন্দ উপভোগ করিল।

মন্মথ—সভ্য ভব্য নব্য যুবক—শিক্ষাসংস্কার-মার্জ্জিত—আধুনিক সুরুচিসম্পন্ন নবনায়ক—পাগলের এই নির্ব্বিকার নিরহঙ্কারের ভাব দেখিয়া

একটু বিস্মিত হইলেন,—তৎসঙ্গে আত্মজীবনের অসারতা উপলব্ধি করিয়া মরমে মরিয়া গেলেন।

পাগল আবার বলিতে লাগিল,—"আখের হারালেই পাগল হয়। আমি আখের হারিয়েছি, তাই পাগল।"

"তুমি অভিমান জয় করিয়াছ, তাই ঠাকুর।"

"তা না হোক্, মান অপমান দুই খুইয়েছি,— তাই—কুকুর।"

পাগ্‌লা আবার হো হো হাসিল। অপরূপ মধুর সে হাস্য!—সে অনির্ব্বচনীয় উদার সরল হাস্যে—শ্রোতার মনের সঞ্চিত ক্লেদরাশি যেন ধীরে ধীরে অপসৃত হইতে লাগিল।

পাগ্‌লা বলিতে লাগিল, "তা—ও ঠাকুর কুকুর দুই-ই এক—কি বলো?"

"ব্রহ্মবিজ্ঞানীর কাছে বটে।"

"কেন পাগলের কাছে নয়?"

"তোমার মত পাগল হোতে পারে বটে"।

"আমি তো পেটের দায়ে পাগল!—বালকের কাছেও কি নয়?"

"বালক অজ্ঞান—তার কাছে সবই সমান।"

"আর তুমি বা তোমরা—যারা হয়কে নয় করে, সত্যমিথ্যায় লুকোচুরি করে, পাটোয়ারী বুদ্ধি চালায়, লোকের গলায় ছুরি দেয়, তারা জ্ঞানী;—কেমন?"

যুবক দেখিলেন, এ পাগল সহজ লোক নয়;—যাহা বলিতেছে, বর্ণে বর্ণে সত্য। পাগলের সে কথার ধার ও ঝাঁজ তিনি সহিতে পারিলেন না;—অবনত মস্তকে মনে মনে সকলই মানিয়া লইলেন। ভাবিলেন, "কি আশ্চর্য্য! এই পাগল এত নিকটে ছিল, এর সম্বন্ধে কিছুই জানিতাম না?"

পাগলও অমনি বলিয়া উঠিল,—"ওগো, সময় হোলেই সব হয়! কীলিয়ে কাঁটাল কি পাকে? ফল পাকবার সময় হোলে আপনিই পাকে।—এই মাত্র না তুমি তোমার গুপ্ত প্রণয়িনীকে

বোল্‌ছিলে,—'তুমি ভগবান্‌কে চাও,—তাঁর ভক্তি-পথ ধোর্‌বে?'—কথাটা কি সত্যি?"

এবার যুবক অতিমাত্র চমৎকৃত হইয়া, মনের সকল ময়লা—সকল জঞ্জাল ছুড়িয়া ফেলিয়া, একেবারে পাগলের পদপ্রান্তে পড়িয়া বলিলেন, "যদি তুমি দয়া করো!—যদি তুমিই আমায় মায়াবিনীর হাত থেকে রক্ষা করো!"

"মনুষ্যের সাধ্য নাই যে, ঐ মায়া-রঙ্গিণীর জাল থেকে তোমায় ছিনিয়ে নেয়! বিশেষ, আমি তো পাগল।"

"হায়, তবে? আমার গতি কি হইবে না?"—বড় আক্ষেপের সহিত—অতি হতাশভাবে—যুবক এই কথা বলিলেন।

উত্তরে পাগল কহিল, "দুরতিক্রমণীয় ঐ মায়া; স্বয়ং মহামায়ারই ঐ খেলা,—মার চরণে শরণ লও।"

"হায়, কোথায় সেই মা?—কিরূপে তাঁহাকে আমি পাইব?"

আত্মশক্তি ভুলে আছ? তুমি তো সামান্য নও বাপ?”

বড় আদরের সহিত পাগল—যুবকের গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। সেইরূপ হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, “সামান্য কেউ-ই নয়,—যখন জীবের জননী—জগদম্বা! সেই জগদম্বাকে যে মা বোলে ডাক্‌তে পেরেছে, তার আবার কিসের ভয়?”

“কিন্তু হায়! এ তত্ত্ব আমায় শিখাইবে কে? তুমিই——”

“কাউকেই শেখাতে হয় না, কোথাও যেতে হয় না;—আপনার ভেতোরেই সব আছে।—ঐ তো শুন্‌লে বাপু,—

‘আপনাতে মন আপনি থেকো,
যেয়োনাকো কারো ঘরে।
যা চাবি, তাই বোসে পাবি,
খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে॥’

—"এই অন্তঃপুররূপ আপনার ঠাকুর-ঘর ছেড়ে, অবিশ্বাসীর আঁস্তাকুঁড়ে, লোকে মোত্তে যায় কেন? হাঁ, তবে ভক্তদের কথা স্বতন্ত্র বটে। তাদের সঙ্গ নেওয়ায় লাভ আছে। তা, ভক্তেরা যে সব এক-জাত।"

যুবক কি ভাবিতে লাগিল। পাগল জিজ্ঞাসিল—"আবার কি সন্দেহ হোলো,—না?"

যুবক বিনীতভাবে বলিল, "আচ্ছা, এই মায়াও কি সেই মার?"

"মার—সকলই সেই মূলাপ্রকৃতির। সেই মা-ই এক রূপে তোর জননী, আর এক রূপে তোর মনোমোহিনী ;—বিদ্যা-অবিদ্যা সবই তিনি।"

"তবে তিনি খেলাইতেছেন?"

"নিশ্চয়—তোর মনের গুণে।"

"কিন্তু মনের মালিকও তো তিনি?"

পাগল একটু হাসিয়া কহিল, "ন্যায়ের ফাঁকি একটা ধোরেছিস বটে,—

'মন-গরীবের কি দোষ আছে।
তুমি বাজীকরের মেয়ে শ্যামা,
যেমন নাচাও—তেম্‌নি নাচে ॥'

অথবা,—

'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন,
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।'—কেমন ?"

যুবক দেখিলেন, পাগলরূপী এই পরমপুরুষের কি গভীর তত্ত্বজ্ঞান,—কি প্রখর অন্তর্দৃষ্টি। মনের সকল কথাই তাঁর পরিজ্ঞাত। এ হেন পাগলের নিকট তাঁহার দাঁড়ানো দায়,—কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন কি ? অতি জড়সড় ভাবে—সঙ্কুচিত হইয়া—হেঁটমুখে তিনি অবস্থান করিতে লাগিলেন।

পাগল বলিতে লাগিল,—"দেখ, ভক্তি আর পাটোয়ারী-বুদ্ধি—দুটো পৃথক জিনিস। খোদার সঙ্গে যারা কারসাজি কোত্তে যায়, তারা কতকগুলা কথা শিখে রাখে,—সেই কথার মার-পেঁচে লোকের কাছে আপনাদের পসার জমায়।—'মন-গরীবের

কি দোষ আছে'—আর 'ত্বয়া—হৃষীকেশ'—ও কোন্ অবস্থার কথারে? মুক্ত, সিদ্ধ, বুদ্ধ না হোতে পাল্লে—ও-কথা বলে কে?—তেম্‌নি, 'মনের মালিক তিনি'—একথা বল্‌বার আগে, একবার ভাব্‌তে পাত্তিস তো, অহংজ্ঞান তোর কতখানি গিয়েছে? হায়রে! এই মন নিয়ে,—এই জুয়াচুরি-ফিরিব্বি-কার্‌চুবি নিয়ে, সংসারী-লোক ভগবান্ লাভ কোত্তে চায়?"

"বাবা, ঘাট হোয়েছে,—আমায় মাপ কর।"

"না, ও একটা কথার কথা বোল্লুম—কিন্তু সংসারী লোকগুলো ঠিক্ ঐরকম কিনা, বল্ দেখি?"

"ঠিক্, একশতবার,—আর আমি ভাবের ঘরে চুরি কোর্‌বো না।"

"ও তোর 'শ্মশান-বৈরাগ্য',—থাক্‌বে না।"

"যদি মার দয়া হয়,—তোমার ইচ্ছা হয়।"

"আমি তো একটা পাগোল,—আমার আবার ইচ্ছা!"

"তুমি সাক্ষাৎ শিব!"

'হো-হো-হো' করিয়া পাগল এবার একটা উৎকট হাস্যধ্বনি করিল। সে ধ্বনিতে যুবকের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। সর্ব্বাঙ্গের ভিতর দিয়া সেই তীব্রহাস্যের স্বর-তরঙ্গ প্রবাহিত হইতে লাগিল। যুবকের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

হাসিতে হাসিতে পাগল কহিল,—"আমি শিবের বাহন—বলদ। বলদের উপর তোমার বিশ্বাস হয়?"

যুবকও এবার যেন কোন অলক্ষ্য শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া কহিলেন, "মানুষের নিকট আমি চিরদিন প্রতারিত হইয়া আসিতেছি,—এইবার হে পরমপ্রেমিক, হে পাগলরূপী পুরুষোত্তম! তুমিই আমায় পার্ করো,—আমার প্রার্থিত বস্তু মিলাইয়া দাও।"

"কিন্তু মোহিনীর মায়া তো তুমি সহজে ছাড়িতে পারিবে না?"

"দয়া করিয়া তুমিই ছাড়াইয়া দাও।"

"আমি দিব ?—আমায় ধরিয়া তুমি উঠিবে ?"

এবার যুবক কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "তাই যেন মনে হয়।"

"তবে কাঁদো, ডাকো,—আর্ত্তের হৃদয় লইয়া মার শরণাপন্ন হও। আমিও তোমার সঙ্গে কাঁদি, ডাকি, মার অভয় পাদপদ্ম আঁকড়িয়া ধরি ;—

"ত্রাহি মাং সর্ব্বতো দুর্গে ত্বং হি দুর্গার্ত্তি নাশিনী,
যন্নাম স্মরণা্ জীব সর্ব্বপাপাৎ প্রমুচ্যতে॥

"এই যে, মা এসেছেন,—মা কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন!—ডাক্, কাঁদ্, মাথা খোঁড়্, মার পা দুটো জড়িয়ে ধর্!—আহা-হা! কি মূরতি রে!—মা, যাসনে, পালাসনে, আমার মাথা খাস—দাঁড়া!—পালালি, গেলি, ফাঁকি দিলি? আচ্ছা যা বেটী, আমিও তোর পেছু নিলুম।—না, ঐ যে, ঐ যে, বিদ্যুদ্বরণা, সস্মিতবদনা, ত্রিনয়না মা আমার—দিক্ আলো কোরে দাঁড়িয়েছেন? দ্যাখ্ রে ভাগ্যবান,—জন্ম সার্থক কোরে দ্যাখ্,—মার ঐ

জগৎ-জোড়া—দিক-আলো-করা অপরূপ রূপ! ঐ শোন্, মা অমিয়স্বরে কি বোল্‌বেন,—

"দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

—"শুন্‌লি? মার আমার আপ্তবাক্য বুঝ্‌লি? আবার শোন্, আবার বোঝ্,—ঐটি মনের মধ্যে তোলাপাড়া কর্,—মার চরণে শরণ নে,—তোর গতি হবে। মার মায়া, দৈবী মায়া,—দুর্লঙ্ঘ্যা গুণময়ী মায়া,—মনুষ্যের সাধ্য কি, এ মায়ার হাত থেকে নিস্তার পায়! মার চরণে ঐকান্তিক ভক্তির সহিত শরণ নে;—মাই তোকে নিস্তার কোর্‌বেন।—হা! হা! হা! আমি এখন চোল্লুম,—মার পেছনে ছুট্‌লুম,—ঐ তোর মোহিনী আস্‌চে। এও মার আর এক মূর্ত্তি। খুব ছেনালি মূর্ত্তি। তুই এই মূর্ত্তি চেয়ে এয়েচিস, এখনো কিছু দিন এই মূর্ত্তি নিয়ে থাক্—সময় হোলেই ছাড়্‌বি। ভয় নি, মার কথাটা মনে রাখিস,—

"দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"

পাগল হো হো অট্টহাস করিতে করিতে ও এক-একবার করুণাপূর্ণ দৃষ্টিতে পশ্চাতে চাহিতে চাহিতে বেগে চলিয়া গেল।

যুবক মন্মথনাথ, তখন ন যযৌ ন তস্থৌ হইয়া স্তম্ভিত ও বিস্মিতভাবে সেই রেলিং-ফটক ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে গম্ভীরস্বরে এই ভগবদ্বাক্য ঘন ঘন ধ্বনিত হইতে লাগিল,—

"দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

লাজ-মান-ভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া মোহিনী তথায় আসিল। কিন্তু যে কারণে হোক্, সে মূর্ত্তিতে এখন আর সে মোহকরী দীপ্তি নাই,—সহজ স্বাভাবিক গৃহস্থ ঘরের কন্যার ন্যায় সে তথায় উপনীত হইল। ধীরভাবে মন্মথকে বলিল, "একটা কথা জানিতে আসিলাম;—সত্যই কি তুমি ভগবান্‌কে চাও?"

মন্মথ প্রথমে কোন উত্তর দিবে না মনে করিল এবং অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইবে ভাবিল, কিন্তু কাজে তাহা পারিল না। না পারিয়া সহজ

স্বাভাবিক ভাবে কহিল, "এ কথা তোমার জানিয়া লাভ কি?

মোহিনী: একটু লাভ আছে বৈ কি? নইলে লোকলজ্জার মাথা খাইয়া, একরূপ এই সদর রাস্তার সাম্‌নে আসিয়া, একথা তোমায় জিজ্ঞাসা করিতে যাইব কেন?

মন্মথ। আমি যে উত্তর দিব, তাহা তোমার সুখকর হইবে না।

মোহিনী। সুখকর না হইয়া দুঃখকর হইলেও আমি সুখী হইব,—যদি তোমার প্রকৃত মনের কথা বল।

ম। আমি পূর্ব্বেই তা বলিয়াছি, পুনরায় সে অপ্রিয় কথা উত্থাপিত করিতে ইচ্ছা করিনা।

মো। তুমি আমায় 'দূর হও' বলিয়াছ, কিন্তু ইহা তোমার মনের কথা বলিয়া আমি বিশ্বাস করিতে পারি না। বরং ইহাতে তুমি আমায় অধিক ভালবাস, ইহাই বুঝিয়াছি।

ঠিক্ এই সময়ে দুইটি শুভ্র সুদৃশ্য কপোত-কপোতী উড়িয়া আসিয়া সেই রেলিং পার্শ্বস্থ ভূখণ্ডে বসিল এবং মনের অনুরাগে—একটি আর একটির প্রতি চক্রাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে 'বক্-বকম্' রব করিতে লাগিল। সেই বক-বকম রূপ প্রণয়ালাপের সহিত তাহার কণ্ঠ স্ফীত হইল, এবং তাহার বিস্তৃত পুচ্ছদেশ ভূপৃষ্ঠে ঘন ঘন ঘর্ষিত হইয়া তাহার ভাল-বাসার গভীরতা প্রকাশ করিল।

সেই নির্জ্জন পুষ্পোদ্যানের ফটক-দ্বারে, অস্ত-গমনোন্মুখ সূর্য্যের শেষ ম্লানরশ্মি অন্তর্ধানের সম-সময়ে, যুবক যুবতীর দৃষ্টিপথে এই প্রাকৃতিক মধুর মিলনদৃশ্য পতিত হইল। দৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। পরস্পর পরস্পরের পানে চাহিয়া অতি সন্তর্পণে পরস্পরকে গোপন করিয়া—এক একটি নিশ্বাস ফেলিল।—আর কেহ তথায় নাই।

মন্মথ কহিল, "তা ও সকল কথা এখানে কেন

মোহিনি? এ একরূপ সদর পথ—কেহ এখানে আসিয়া দেখিতে পাইবে?”

মো। দেখিতে পায়, ক্ষতি কি? তোমার মনে ত কোন কু নাই।

ম। কিন্তু তোমারো ত একটা দুর্নাম রটিতে পারে।

মো। সে দুর্নাম যাহা রটিবার রটিয়াছে,—এখানে না দাঁড়াইলেও রটিবে।

ম। আজ তবে আমায় বিদায় হইতে দাও,—আর একদিন তোমায় এ কথার উত্তর দিব।

মো। ‘দূর হও’ যখন বলিলে, কৈ, তখন ত ‘আর একদিনের’ অপেক্ষা কর নাই?

ম। সে আমার অপরাধ হইয়াছিল,—আমায় ক্ষমা কর।

মো। তবে তুমি না বলিলেও আমি মনে করিয়া লইতে পারি যে, তুমি আমায় ভালবাস?

এবার মন্মথ একটু গোলে পড়িল, কিন্তু তখনই

ধাঁ করিয়া উত্তর দিল,—“তা এরূপ ভালবাসা শুধু তোমায় কেন, আমি আমার এই বাগানের উড়ে-মালীকেও বাসি।”

মোহিনীও হটিবার পাত্রী নয়,—মুখের উপর বলিল, “আমি আমার টীয়ে-পাখীকেও বাসি। কিন্তু তুমি যে ভগবান্‌কে ভালবাসিতে গিয়াছ, সে কিসে?”

মন্মথর মনের ভিতর আবার যেন সব কেমন গোলমাল হইয়া গেল। আবার দো-টানায় পড়িয়া, যুবক হাবুডুবু খাইল। যাই হোক, একটু সাম্‌-লাইয়া বলিল, “সত্য বলিব?”

মো। তাহাই আমি শুনিতে আসিয়াছি।

ম। তোমার ভয়ে মোহিনি,—তোমায় ভুলিতে।

মো। প্রেমের টানে অথবা ভক্তির আকর্ষণে তা হইলে নয়?

ম। উপস্থিত সে সৌভাগ্য আমার হয় নাই।

মো। হইবে—সে আশাও কম।

মন্মথ এ কথার আর কোন উত্তর দিলনা,—উৎসুক চিত্তে তথা হইতে অপসৃত হইবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

মোহিনী পুনরায় কহিল, "ভয়ে ভগবান্‌কে ভজন—স্থায়ী হয় না। ভক্তিতে যে ভজন, তাহাই স্থায়ী ও কার্য্যকরী হয়। আমি এই কথাটি বলিবার জন্য এখান পর্য্যন্ত আসিয়াছি। বুঝিলাম, শীঘ্র ও সহজে তুমি আমায় ভুলিতে পারিবে না।

ধীর মন্থরগতিতে, গজেন্দ্রগমনে, মোহিনী চলিয়া গেল। রূপ-তৃষ্ণ মন্মথ সেইখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া রূপসীর সে গম্ভীর গমন-ভঙ্গি দেখিল। সেই দেখার সহিত মনের চোখ—অথবা কল্পনার দৃষ্টি বুঝি অধিকতর দৃষ্টিশালী হইল; সে দৃষ্টিতে মনে হইল,—"হে প্রজ্ঞারূপী বিবেক, তুমি আর কিছুদিন অপেক্ষা কর, আমি একবার ইহজীবনের এ চরম সাধটি মিটাইয়া লই, তারপর তোমার সহিত চির-

মিলিত লইব। তোমার মিলনে, এ অমৃত-মদিরা ত আর পাইব না ?—তাই একবার—মাত্র একবারের জন্য আমায় ছাড়িয়া দাও। কিন্তু তুমি পাগলরূপী পুরুষোত্তম! সে দুর্দ্দিনে আমায় আর একবার দেখা দিও।"

হাঃ হাঃ হাঃ করিয়া সহসা সেই পাগল কোথা হইতে আসিয়া উচ্চহাসি হাসিতে হাসিতে বলিল, "বাঃ বাঃ বাঃ! কি পরেশ পাথরের টান্‌রে!—চপলার চমকও যেন হার মানে!—কিগো বাবুজী, এই বুঝি তোমার—মাকে ডাকা ?"

মন্মথ অতিমাত্র চমকিত হইল; বিস্ময়ে তাহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল,—"একি সত্যই এ অন্তর্য্যামী ?—আমার মনের এ নিভৃতস্থান স্পর্শ করিল কিরূপে ?"

পাগল আপন খেয়ালেই বলিতে লাগিল, "তা ডাক্‌বেই বা কেমন কোরে ? মোহিনী যে বুক জুড়ে রয়েছে ? হাঁ, আগে ওকে নামাতে হবে। রোজায়

যেমন ভূত নামায়, সেই রকম কোরে নামাতে হবে ;—তারপর মায়ের ডাক্। কেমন, না ? তবে তাই।”

এই বলিয়া পাগল আপন খেয়ালে বলিতে বলিতে চলিয়া গেল ;—

“আয় মোহিনী, সোনামণি, লক্ষীটি আমার।
আঁচল ধোরে থাক্‌বে মায়ের, ভাবনা কিগো তার॥
এক বঁধুয়া যাবে তোমার আর বঁধুয়া পাবে।
মনের সুখে নিত্য তুমি কত মধু খাবে॥
ব্যাগ্যেত্তা ভাই, দোহাই তোমার, এরে দাও ছেড়ে।
কাল-নাগিনীর মত আর ধোরোনাকো তেড়ে॥”

লজ্জায় সরমে—মরমে মরিয়া, মন্মথ যেন কাটা-ছাগলের ন্যায়—যন্ত্রণায় ধড়ফড় করিতে লাগিল। মনে মনে বলিল, “মা মেদিনি, তুমি দু-ফাঁক হও, আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ করি। আর এ ক্ষীণ-শক্তির ব্যর্থ সম্প্রসারণে, যুঝিতে পারিনা দয়াময়ি !”

—✻—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নির্জ্জন দেব-মন্দির। পল্লীপ্রান্তে এই মন্দির অবস্থিত। লোকসমাগম সেখানে বড় একটা হয় না। বহুকালের প্রাচীন এক শিবলিঙ্গ সে মন্দিরে স্থাপিত। লোকে সে লিঙ্গমূর্ত্তিকে 'বুড়ো শিব' বলে। সেই বুড়োশিবের নির্জ্জন, লোককোলাহল-শূন্য, শান্তিময় মন্দির-চত্বরে বসিয়া, মনের জ্বালা জুড়াইতে,—মনকে পবিত্র, পঙ্কিলতাশূন্য, সংযত করিতে, মন্মথনাথ ব্যাকুল অন্তরে প্রার্থনা করিতে-ছেন। কামারি, কন্দর্পদর্পখর্ব্বকারী সদাশিবের কৃপায়,—যদি তাঁর মোহিনীর প্রতি মত্ততা কমিয়া

যায়,—সেই কুহকিনীকে যদি তিনি ভুলিতে পারেন —এই আশা। নিবিষ্ট মনে, নিমীলিত চক্ষে, অনেকক্ষণ তিনি সেইখানে বসিয়া আছেন,—প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে,—এমন সময় সহসা তাঁহার হৃদ্-তন্ত্রীতে ঘা দিয়া, শ্লেষকণ্ঠে কে বলিয়া উঠিল,—

"ভাঙা ঘর, জ্যোৎস্নার আলো, যেদিন যায়, সেদিন ভালো।"—অত ভাবচিস্ কি? লে বেটা, লে—খেয়ে লে, মেখে লে, চেকে লে!"

"একি! আবার?—এখানেও তুমি?"

"রামা পাগ্‌লা সকল ঠাঁই,
সাচ্চা ঝুঁটা পরখ চাই।"

"সত্যই কি তুমি পাগল?"—আবার যুবকের একটু সন্দেহ আসিল। পাগ্‌লা হাসিয়া বলিল,—

"তোমার যেমন মাথা গোল!"

মন্মথ একটি নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "আচ্ছা, আমি কি পাবো?"

"পাবি, কিন্তু দেরী আছে,—এখনো সময় হয় নি ?"

"তবে ?"

"তবে আর কি ? দুর্গা বোলে ঝুলে পড়ো।—মনের অগোচর ত কিছু নেই ?"

হাঃ হাঃ হাঃ করিয়া পাগল হাসিয়া উঠিল। সেইরূপ হাসিতে হাসিতে, হাতে তালি দিতে দিতে কহিল,—

"আশ মিটে মধু খাই প্রাণে আছে সাধ,
কাঁটা ফোটা জ্বালা কিন্তু সেই বড় বাদ।

—কেমন গো বাবু মশাই, এই কিনা ?"

বাবু ওরফে মন্মথ চমকিত হইল,—মনে মনে বলিল, "ওঃ! কথাগুলা কি জ্বালাময়!—যেন আগুনের হল্‌কা গায়ে ছড়িয়ে দেয়!—না, এ লোক সহজ নয়—মনের কথা সব বুঝ্‌তে পারে। নিশ্চয়ই এ কোন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ। একে বন্ধুভাবে দেখ্‌তে হবে।"

পাগ্‌লা উচ্চ মধুর হাসি হাসিয়া কহিল, "শুধু মিতে পাতালে হবে না,—আরো কিছু পাতাতে হবে। তা তুই পার্‌বি। কিন্তু দেখিস, খুব হুঁসিয়ার থাকিস,—ভাবের ঘরে কখনো চুরি করিস নে।"

"তাতো কোরবো না বোলেছি।—কিন্তু তাতে কি হয়?"

"কি হয়?—এ-কূল ও-কূল—দু-কূল যায়। —কোনটাই পাবিনে।"

"তার ফল?"

"যাওয়া আর আসা, আসা আর যাওয়া।"

"এমন কতকাল?"

"তার সংখ্যা নেই।—তাই বলি, শীঘ্‌গির শীঘ্‌গির মিটিয়ে নে।"

"কিন্তু, ঐ যে—'হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব'—"

"রেখে দে তোর 'কৃষ্ণবর্ত্মেব'!—বেটা কৃমি-কীট, আবার শাস্ত্রের বচন আওড়ায়!—তোরাই

ঋষিদের নাম ডোবালি!—'ভাবের ঘরে চুরি' কোরে 'পাটোয়ারী-বুদ্ধি' চালানই বুঝি বেশী পুরুষার্থ?"

মন্মথর বুক এবার কাঁপিয়া উঠিল। পুণ্যাত্মা পাগলের সেই মর্ম্মভেদী, সরল, সত্যবাক্যে তাঁহার হৃদয় মুহূর্ত্তকালের জন্য আলোড়িত হইল। তিনি স্তম্ভিত হইলেন। বিনীতভাবে জোড়হস্তে কহি-লেন, "বাবা, আমার ঘাট্ হোয়েছে,—ক্ষমা করো আর কখনো এমন বাচালতা কর্‌বো না।"

"আমার কাছে কোল্লি না কোল্লি, তোর বোয়ে গেল,—কিন্তু তোর প্রাণের ভেতোরে যে আছে, তাকে ফাঁকি দিস্‌নে।—'হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব'—ও কাদের রে? যারা অন্তরে কাম-কাঞ্চনত্যাগী, বৈরাগী, নিবৃত্তির পথ ধোরেছে, তাদের পক্ষে ঐ শাস্ত্রের অনুশাসন একশত বার;—আর তুই বেটা 'রমানাথের এঁড়ে',—দিনরাত মনের খোলা মাঠে গুড়ুগ্-গাঁ গুড়ুগ-গাঁ কোরে বেড়াচ্ছিস,—লজ্জা-

মান-ভয়ে কিছু কোত্তে পাচ্চিস না,—তুই বোলিস কিনা—'হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব' !"

"ঠিক্, ঠিক্, অতি ঠিক ! মনটাকে পাঁকে রেখে বাহিরে আমরা সাবান ঘসি ! পালিস-করা সভ্যতার আবরণেই আমাদের মনুষ্যত্ব !"—মন্মথ মনে মনে এইকথা বলিতে বলিতে মরমে মরিয়া গেলেন।

পাগল বলিতে লাগিল,—"দাম্ড়ার পিঠে দাম্ড়া উঠ্তে দেখেচিস ? তোরা সেই দাম্ড়া জাতীয়। সংস্কারদোষেই সব হয়। দামড়া, দাম্ড়া হবার আগে ও-রসের আস্বাদ পেয়েছিল কিনা ? বেশী বয়সে দাম্ড়া হোয়েছিল বোলেই ওটি হয়েছিল—সবই সংস্কারের খেলা।"

"বাবা, আমারো তবে এ সংস্কার ?"

"দুর্জ্জয় সংস্কার,—এ জন্মের না হোক্,—জন্ম-জন্মের সংস্কার।—তাই উঠি-উঠি কোরেও উঠ্তে পাচ্ছিস নে। এখন একটা গান শোন্।"

রামা পাগ্লা গান ধরিল। অতি মিষ্ট, অতি

স্পষ্ট, অতি পবিত্রকণ্ঠে গান ধরিল। গান কিন্তু একটি অতি সামান্য,—পাগলেরই উপযোগী। কিন্তু সে কণ্ঠ সামান্য নয়,—যেন দেবকণ্ঠ, অথবা দেবদুর্লভও সে কণ্ঠ। সেই সুধাবর্ষী ভক্তিপূর্ণ কণ্ঠে পাগ্‌লা গাহিতে লাগিল,—

"ঢেলে দেনারে প্রাণটা মার পায়।
ছুটী পাবি, ঘরে যাবি, ঠেক্‌বিনিরে কোন দায়॥
নাইকো কোন খরচ-পত্র, চেষ্টা শ্রম জমি-যোত্র,
সরলতা কেবলমাত্র, ইহার উপায়।—
চিন্‌বি কি মন, এমন রতন, এবার এ কাট্‌মায়॥

—দ্দুয়ো! তুই হেরে গেলি, মণিলালের জিৎ হোলো! তা হার্, হার্‌তে হার্‌তেও কান্নাকাটী কোরিস,—মার দয়া হবে।"

"অনুতাপই তা হোলে এর ঔষধ?"

"হাঁ, তার সঙ্গে প্রাণের টান্‌ও চাই।—বিষয়ীর বিষয়ের টান্, মার—ছেলের টান্, সতীর—পতির টান্,আর নষ্ট মেয়ের—উপপতির টান,—এই চার-

টান্ একত্র কোল্লে যেমন হয়, সেই রকম প্রাণের টান্ চাই।—ঐ যে, তোরা সাধুভাষায় যাকে প্রার্থনা ও ব্যাকুলতা বোলিস্। কিন্তু খবরদার! খুব হুঁসিয়ার্! মনের মধ্যে গোঁজামিল দিস নে,—কামে আর প্রেমে এক কোরিস নে।"

পাগল এমন ভাবে কথাগুলি বলিল যে, তীক্ষ্ণ কণ্টকবিদ্ধের ন্যায়, মন্মথর মর্ম্মে মর্ম্মে তাহা বিঁধিয়া গেল। তিনি অবাক্ হইয়া পাগলের পানে চাহিয়া রহিলেন। পাগল পুনরায় বলিতে লাগিল,—

"ওরে বাপ্‌রে! প্রেমটা কি সোজা জিনিস রে?—যে মনে কোল্লেই বাগিয়ে নেওয়া যায়? তা যদি হোতো, তো সবাই ও-জিনিসটা মেরে নিতো!—ওরে, ওতে ধন মান জীবন যৌবন সব সোঁপে দিতে হয় রে!—আপনাকে একেবারে বিসর্জ্জন কোরে, তবে ও-পথের পথিক হোতে হয়। ও সম্বন্ধে একটা গান শোন্। আমার এক প্রিয়-

শিষ্য, এই গান শুনিয়ে, তার হতভাগী যুবতী স্ত্রীকে বশে এনেছিল,--গানটা শুনে রাখ্।”

পাগল আবার মধুরতম কণ্ঠে গান ধরিল,—

“প্রেম করা কি মুখের কথা, পদে পদে সইতে হয়।
প্রাণটি দিতে যে জন পারে, তারি প্রেম শোভা পায়॥
ভালবাসে যে প্রাণে প্রাণে, সে কি কোন বাধা মানে,
লজ্জা-মান-ভয়ে তিনে, জলাঞ্জলি আগে দেয়॥
তারে বোল্‌তে হয় না কোন কথা,মনে নেয় সে মনের ব্যথা,
তাতে যদি বুকে চিতা, জ্বাল্‌তে হয় তো জ্বেলে নেয়॥”

মন্মথ একটা মর্ম্মচ্ছেদকর নিশ্বাস ফেলিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন,—মনের মধ্যে তাঁহার যুদ্ধ চলিল। পাগল বিরক্ত হইয়া বলিল, “তবে মর্ বেটা ভেবে ভেবে! তুই মনে চাচ্চিস এক, আর মুখে বোল্‌চিস আর্;—না, ভাবের ঘুরে চুরি তোর যাবে না দেখ্‌চি।”

“কিন্তু ডুব্‌লে কি আর উঠ্‌তে পার্‌বো?”

“এখন তবে উঠে আছিস্ নাকি? ডুবেই তো

রোয়েছিস্—কেবল লোকের চক্ষে ধূলো দিয়ে সাধু সেজে বেড়াচ্চিস বৈত নয়? তা তোর্ কপালের যেমন ভোগ!”

“কর্ম্ম দিয়ে তা হোলে কর্ম্মফল খণ্ডন কোত্তে হবে?”

“হাঁ, যেমন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। কিন্তু শেষ দুটো কাঁটাই ফেলে দিতে হবে। মনের উদ্ধার হোলেই—বাস্! ছুটী!—তারপর পাঁকেই পড়্, আর পুষ্পক-রথেই ওঠ্—ও দুই সমান।”

“আর এখন?”

“কিছুই হয় নি—এ-পক্ষেও নয়, ও-পক্ষে নয়। তাই বোল্‌চি, চটপট্ সেরে নে, মনে ক্ষোভ রাখিস্ নে। ‘দিল্লীর লাড্ডু’—একবার চেখে দেখা ভাল। নইলে আপ্‌সোস্ থাক্‌বে। এর পর সত্যি সত্যিই যদি উঁচুতে উঠিস্,—কোন্ দিন হয়ত ঝুপ্ কোরে পোড়ে যাবি। তাই আগে বোনেদটা শক্ত কর্। আরো কিছু পোড়্ খা।”

"কিন্তু বাবা, 'দিল্লীর লাড্ডু' যে না খায়, সেও যেমন পস্তায়, যে খায়, সেও তো তেম্‌নি পস্তায় ?"

"সকলে নয়। যার যেমন রোগ, তার তেম্‌নি ব্যবস্থা। তোর স্বভাব ও সংস্কার বুঝে আমি এই ব্যবস্থা কোচ্চি। কিন্তু মণিলাল কি এ পথে এসেছে ?"

মণিলাল পাগলের আর একটি ভক্ত। তাঁর পরিচয়, পাগল একে একে দিল ;—কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগী, সংযমী, চিরকুমার তিনি ;—নিবৃত্তিই তাঁর শান্তি। সেই ভক্তের সবিশেষ পরিচয় পাইয়া মন্মথ বলিল,

"তা বটে।"

"তবে অত কথা-কাটাকাটি কোচ্চিস্‌ কেন ?—যা বলি, শোন্‌। বেটার গা দিয়ে কামগন্ধ ফুটে বেরুচ্চে,—যুবতী-যৌবনের রতিরসের কামনা দিন-রাত মনের মধ্যে টগ্‌বগ্‌ কোরে ফুট্‌চে,—আর

মুখে শুকদেবের তত্ত্বজ্ঞানের কথা।—ও সব ভণ্ডামী আমার কাছে চোল্‌বে না।”

মন্মথ দেখিলেন, এ পাগলরূপী মহাপুরুষের নিকট আত্মবঞ্চনা করাই বিড়ম্বনা। ধরা দেওয়াই ভাল, সাফ্ সকল কথা স্বীকার করাই শ্রেয়ঃ। এইবার মুক্তকণ্ঠে তিনি মনের পাপ স্বীকার করিলেন। মনের সব বেড়-বাড়্ খুলিয়া বলিলেন, “আজ পাঁচবৎসর ধরিয়া রূপসী মোহিনীর রূপ-মোহে আমি মুগ্ধ,—কিছুতেই তাহাকে ভুলিতে পারিতেছি না।”

“সাধ্যি কি তাকে ভুলিস? তার ‘অরা’ তোর গায়ে লেগেছে,—তার সূক্ষ্মরূপ তোর হাড়ে হাড়ে রক্তে রক্তে মিশেছে,—তার রক্ত না খেয়ে কি তোর তেষ্টা মিট্‌বে? মেট্‌বার হোলে তোকে নিবৃত্তির পথে যেতে বোল্‌তুম। কিন্তু সে ধাত্ তোর নয়। রাগ করিস্ নে,—এ তোর জন্মের দোষ, জীবনের দোষ।—তাই বোল্‌ছি বেটা, চট্‌পট খেয়ে নে,—মেখে নে,—চেখে নে।”

"তবে বাবা, আপনি আশ্বাস দিচ্চেন,—আমার গতি হবে ?"

"গতি তোর তো হোয়েই আছে,—কেবল মাঝ-খানের এই খানিকটায় কর্ম্মভোগ। তা এ ভোগটা যদি না ভুগে যাস,—কোন রকমে ধামা চাপা দে ঢেকে রাখিস,তো আবার ঘুরে ফিরে আস্‌তে হবে ;—তখন পারার ঘায়ের মত আবার এ ঘা ফুটে উঠ্‌বে। —জানিস তো, পারার ঘা সাতপুরুষ অবধি যায় !"

"বলেন কি ? জন্মান্তরেও এর জের্ যাবে ?"

"যাবে না ? পাপ জিনিসটা কি মনে করিস ? লুকিয়ে পাপ কোল্লে যদি বেমালুম চাপা পোড়্‌তো, তাহোলে আর সৃষ্টি থাক্‌তো না। মনের পোষা পাপ একটা ব্যাধি। শুধু ব্যাধি নয়,—মহাব্যাধি। আমি তোক্কে সেই মহাব্যাধির হাত থেকে নিস্তার কোত্তে চাই।"

"ক্ষমা কোর্‌বেন, একটা সংশয় হোচ্চে—পাপ কাজ দিয়ে পাপকাজের খণ্ডন হবে ?"

"সাপের বিষেই বিকারের ঘোর কাটে। আর বোলেছি তো, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা? কিন্তু শেষ দুটো কাঁটাই ফেলে দিতে হবে।—সেটা যেন মনে থাকে।"

মন্মথ একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কিছু বুঝতে পাচ্ছি না,—মাথা গুলিয়ে যাচ্চে।"

"তাতো যাবেই রে বেটা? কেউটে সাপ নিয়ে খেলা কি সহজ? ধূলো-পড়া মন্তোর শিখে তবে সাপ খেলাতে হয়।"

"বাবা, আমায় তবে সেই মন্ত্র দাও?"

"দিয়েছি রে বেটা, দিয়েছি,—তোর বল্‌বার আগেই দিয়েছি। এখন এই আয়।"

পাগ্‌লা মুহূর্ত্তকাল ধ্যান-নিমীলিত থাকিয়া, হাসি-হাসি মুখে মা-মা বলিতে বলিতে, মন্মথর মস্তকে ও বক্ষেঃ হাত বুলাইয়া দিল।

কি অমৃতশীতল,নবনীতকোমল—সে করস্পর্শ! -মানুষের হাত কি এমন হয়?—কে এ পাগল?

সহসা সেই অনঙ্গশরপ্রপীড়িত—মনে মনে দারুণ ক্ষতবিক্ষত সেই যুবা—কেমন হইয়া গেলেন। তাঁহার হৃদয়ের সকল উত্তাপ যেন যাদুমন্ত্রে নির্ব্বাপিত হইল। "যেন আগুন-ভরা এঞ্জিনে কে সমুদ্রের জল ঢালিয়া দিল।"—মুগ্ধনেত্রে তিনি পাগলের পানে চাহিয়া রহিলেন।

পাগল হাসিয়া বলিল, "দেখিস কি, পাগলের খেয়াল! কেমন, এখন কি আর মনের ভেতোর আন্‌চান্ কোচ্চে?—সেই রি-রি-রির রেস্—কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চিস?"

সজলনয়নে, আর্দ্রহৃদয়ে, মন্মথ উত্তর করিল,—"না বাবা।"

"এখন 'না' বটে, সময়ে কিন্তু আবার আস্‌বে। হাঁ, এ যে জন্মজন্মের সংস্কার। তা ভয় নি, তুই পার্ পাবি।—একটা কাজ কোত্তে পারিস?"

"কি বাবা কি?"—অতি আগ্রহ সহকারে মন্মথ পাগলের উত্তরের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

পাগল বলিল, "আমাকে তোর বিশ্বাস হয় ?"

"অন্তর্য্যামী মহাপুরুষ বলিয়া তোমায় জানিয়াছি, —তোমাকে বিশ্বাস হইবে না বাবা ?"

"শেষ কুমীরকে কলা দেখাবিনি তো ?"

"বাবা, আপনি এমন অনুমতি কোচ্চেন ?"

"কি জানি, তোরা বিষয়ী লোক, কাজের দায়ে সব বোলিস, সব কোরিস।"

মন্মথ ছল-ছল চক্ষে, কাঁদ-কাঁদ মুখে, মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন।

পাগল এবার এক অন্তর্ভেদিনী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া যুবককে দেখিয়া লইল। আল্‌মারীর গায়ে কাচ থাকিলেও যেমন তাহার ভিতরের সব জিনিস দেখা যায়, পাগল ঠিক্ সেইরূপ করিয়া মন্মথর হৃদয়-আল্‌মারীটি দেখিয়া লইল। সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, "হাঁ, চোল্‌বে, চোল্‌বে,—তোর দিয়ে মার কাজ চোল্‌বে। এখন যা বলি, শোন্।"

মন্মথ জোড়হস্তে কহিলেন, “কি অনুমতি করুন।”

“আমায় শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বাস কোত্তে পার্‌বি ?”

মন্মথ দৃঢ়চিত্তে বলিলেন, “নিশ্চয়।”

“জীবনে মরণে ?”

“এ জীবন আপনার পাদপদ্মে উৎসর্গ করিলাম।—আপনার যথা ইচ্ছা করিতে পারেন।”

“সত্যি আমায় ব-কল্‌মা দিলি ?”

“সত্য।”

“সত্যি দিলি ?”

“সত্য।”

“তিন সত্যি কর্‌।”

মন্মথ দৃঢ়চিত্তে আবার সত্যবদ্ধ হইলেন।

পাগল সন্তুষ্ট হইয়া কহিল, “ব-কল্‌মা কি জানিস তো ? তোর আর আপনার বোল্‌তে কিছু রইল না,—এখন সব আমার। আমি যা

কোর্‌বো, তাই তোর মেনে নিতে হবে।—কেমন, পার্‌বি ত ?”

মন্মথ সর্ব্বান্তঃকরণে ও আকার-ইঙ্গিতে—পুনরায় দৃঢ়তার সহিত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

পাগল বলিল, “সু কু, ভাল মন্দ, তুই কিছু বাদ-বিচার কোত্তে পার্‌বি নে;—আমি যা বোলবো, নিঃসন্দেহে কোরে যাবি। কাঁটা-বন দে হিড়্-হিড়্ কোরে তোকে টেনে নে যাই,—আর পুষ্পক-মথে চড়িয়ে নিয়ে আরামে বেড়াই,—তোর মুখে বা মনে টুঁ শব্দটি ফুট্‌বে না। তা হোলেই আমি ফেলে পালাবো ;—কেমন পার্‌বি তো ? ভাল কোরে বুঝে-সুজে বল্,—এতে রাজী আছিস তো ?”

সহসা পাগল সুধামাখা মা মা ধ্বনি করিতে করিতে মহাভাবে আকৃষ্ট হইল। মুখে দিব্যজ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল। সর্ব্বাঙ্গে ভাব-তরঙ্গ বহিতে লাগিল। সে অলৌকিক অভিনব দেবমূর্ত্তি দেখিয়া, মূর্ত্তিতে

স্বর্গের ছবি উপলব্ধ করিয়া, মন্মথ বিহ্বলকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—

"গুরু, ইষ্টদেবতা,অন্তর্য্যামি! পাগলবেশে আর আমায় কেন ছলনা কোচ্চেন? আমি একান্তই তোমার পদাশ্রিত।"—বলিতে বলিতে আবেগভরে, যুবক সেই পাগলের পাদদেশে আছাড়িয়া পড়িলেন।

পাগলও যেন অমনি অতি ত্রস্তভাবে সরিয়া দাঁড়াইয়া—বলিতে লাগিল,—"আরে রাম, রাম! বলে কি, বলে কি? চুপ্, চুপ্, মানুষকে ঈশ্বরজ্ঞান? লোকে গায়ে ধূলো দেবে,—সভ্য-সমাজে স্থান পাবিনে। বড়লোকের ছেলে—বড় সুখী ও অভিমানী তুই,—সে জ্বালা সইতে পারবিনে। —আরে চুপ্, চুপ্, চুপ! যা বোলেচিস বোলেচিস, একথা আর মুখ ফুটে কাউকে জানাস নে;— এখন আর একটা গান শোন্।"

পাগল আবার সেই সুধাবর্ষী কণ্ঠে একটি ভাবের গান গাহিতে লাগিল,—

"মনের কথা কৈব কি সই, কইতে মানা।
দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না॥"

—"কেমন এই কি না?"

মন্মথ নির্ব্বাক্ হইয়া অনিমেষ নয়নে, পাগলকে দেখিতে লাগিলেন, পাগল হাসি-হাসি মুখে আবার গাহিল,—

"মনের মানুষ হয় যে জনা, নয়নেতে যায় গো জানা,
সে দু'একজনা,—
সে যে উজান-পথে করে আনাগোনা।
মনের মানুষ—উজান্-পথে করে আনাগোনা।
রসের মানুষ—উজান্-পথে করে আনাগোনা।
রসে ভাসে, রসে ডোবে, ও সে কোচ্চে রসের বেচা-কেনা॥"

গান সমাপনান্তে পাগল কহিল, "কেমন, এই ঠিক্ কি না?—এইটি যেন মনে থাকে। মনের কথা ভেঙেছ—কি মোরেছ! লোকে পাগল বোল্‌বে, গায়ে ধূলো দেবে,—হেনেস্তা কোর্‌বে। উহুঁ, ও

কচি-ধাতে তা তুই সইতে পার্‌বি নে। এখন ঘরের ছেলে ঘরে যা। যখন সত্যি ব-কল্‌মা দিলি, তখন আজ থেকে তোর ছুটী।”

“বাবা, আর একবার পদধূলি দাও।”

“ধূলো টুলো আর তোর নিতে হবে না, এখন থেকে তুই কেবল আমায় ছাখ্‌ আর ভাব্‌। তোর পাপপুণ্যি মন প্রাণ সব তো আমায় দিয়ে দিলি?—তবে আর কেন,—তোর ছুটী;—যা ঘরে যা। কিন্তু মনে রাখিস্‌,—

“ভাঙ্গা ঘর জ্যোৎস্নার আলো,
যেদিন যায় সেদিন ভালো।”

হাঃ—হাঃ—হাঃ করিয়া পাগল আবার হাসিল। উচ্চ মধুর শুদ্ধ সুপবিত্র সে হাস্য; হাসিতে উজ্জ্বল শ্বেত মুক্তাবলীর ন্যায় সুদৃশ্য দন্তপাঁতি অতি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। মুখখানি অতি সুন্দর দেখাইতে লাগিল। তেমন সুন্দর

স্মিতময়,—তেমন পবিত্র ভক্তিপূর্ণ মুখ, অনেক পুণ্য-ফলে দর্শন হয়। হায়, কে এ পাগল? পাগলের হাসিমুখ এত সুন্দর? যেন ব্রহ্মাণ্ডের সকল রহস্য সে হাসিতে উদ্ভাসিত। সে অনির্ব্বচনীয় হাসিতে যেন সকলেই আকৃষ্ট।

হাসির এই অলৌকিক আকর্ষণী শক্তি দেখিয়া,—বাবুরূপী সেই ভক্ত স্তম্ভিত হইলেন। বুঝিলেন,—"আজি জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণে, এ পাগলরূপী পুরুষোত্তমের সহিত মিলিত হইয়াছি।"

পাগল পুনরায় সেইরূপ হাসিতে হাসিতে কহিল, "ভাঙা ঘর জ্যোৎস্নার আলো, যে দিন যায় সে দিন ভালো।—মন খারাপ কোরিস্ কেন?—লে বেটা, লে—খেয়ে লে, মেখে লে, চেকে লে।—ভয় কি, আমি তোর আছি!"

উঃ! কি তীব্র বিদ্রূপাত্মক জ্বালাময়ী সে উক্তি! যুবকের হৃদয়ে কে যেন কণ্টক ফুটাইয়া দিল। তাঁহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে,

গভীর শ্লেষ-বাক্যে—যেন অশ্রান্ত ধ্বনিত হইতে লাগিল,—

"লে, বেটা, লে,—খেয়ে লে, মেখে লে, চেকে লে!"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মোহিনী—কে এ মোহিনী? মোহিনী, না মায়া-রঙ্গিণী?

ধনীটি যে কে, তাহা নিম্নলিখিত কথোপকথনেই বুঝা যাইবে।

"সেই এক দিন, আর এই এক দিন!—সে দিনের কথা আর কি মনে আছে মোহিনী?

"মনে সবই আছে বড় বাবু! কেবল মোর্‌বো কবে, তাই মনে নেই।"

"মরণের কথা মনে কোল্লেও আছে, না কোল্লেও আছে।—বেঁচে থাকার কালে, তাহা মনে করাই পাপ।"

মোহিনী মনে মনে বলিল, "পাপপুণ্যের জ্ঞান তোমার কেমন টন্‌ট'নে, তা আমি জানি,—আর জানেন যিনি অন্তরযামী।"

বড় বাবু ওরফে প্রমথ—মন্মথর বড় ভাই—ঘোর বিষয়ী—মত্‌লবী পুরুষ কহিলেন, "কি সোহিনী, চুপ কোরে রইলে যে? আমাকে তুমি একটা পাষণ্ড নাস্তিক বোলেই জানো—না?"

সোহিনী—হতভাগিনী পতিতা—মোহিনীর বড় বোন্‌—প্রমথেরই চক্রান্তে তাহার নারীধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছিল, তাহারই প্রলোভনে প্রলুব্ধা হইয়া আপনার অমূল্যনিধি বিসর্জ্জন করিয়াছিল, কিন্তু হতভাগিনীর জাতই গেল, পেট আর ভরিল না। ধনের লোভে যে, সে জাত দিয়াছিল, ঠিক্ তা নয়, অতৃপ্ত যৌবনের উদ্দাম কামনানলেই, হতভাগিনী আপনাকে আহুতি দিয়াছিল। সে আহুতিদানের ফলে ধিকি ধিকি পুড়িল মাত্র, একেবারে ভস্মীভূত হইল না। ভাবিয়াছিল, বুঝি তাহাতেই সুখ, তাহা-

তেই তৃপ্তি ; কিন্তু পরে বুঝিল,না—তাহা মৃগতৃষ্ণিকা মাত্র;—হায় ! অন্তরের দাহ আরো বাড়িয়া গিয়াছে। —শুধু তাই নয়, যে পাপিষ্ঠ নরাধম নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর ক্রীড়াচ্ছলে, আঁধারে আলেয়ার আলো দেখাইয়া এ ঘোর অধর্ম্মে তাহাকে নিক্ষেপ করিয়াছিল, সেই পিশাচই আবার কিছুদিন পরে তাহাকে ঘোর অবজ্ঞা ও ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে যেন একটু আমোদও উপভোগ করিতে লাগিল। বাঘ ও বন্যবিড়াল যেমন শীকার ধরিয়া, সে শীকারকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া, তাহাকে একেবারে প্রাণে না মারিয়া,কিছুক্ষণ যেমন তাহাকে লইয়া ম্যাক্‌রা-মেক্‌রি করে,—তাহাকে মর্ম্মান্তিক জ্বালা ও সাংঘাতিক কষ্ট দিয়া হিংসার খেলা খেলাইতে খেলাইতে যেমন মনে মনে সুখবোধ করে, নরাধম প্রমথও ঠিক্ সেই ভাবে সোহিনীর ধর্ম্মনষ্ট করিয়া, আমোদভরে উপেক্ষার হাসি হাসিতে লাগিল। মনে করিল, ‘আমার উপর আর

কে ?—এমনি দিন আমার চিরদিনই যাইবে! যখনি আবশ্যক হইবে, সোহিনী বা এই জাতীয় জীব দিয়া—তাহা আমি সম্পন্ন করিয়া লইতে পারিব।—অর্থে ও সামর্থ্যে কি না হয় ?" তাই সোহিনীর সহিত নরাধমের মৌখিকভাব ও ভালবাসার দোকানদারী।

সোহিনীও তা হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছিল; নীরবে নিশ্বাস ফেলিয়া পাপিষ্ঠের পতন দেখিতে—সে কালের প্রতীক্ষা করিতেছিল; কতদিনে দর্পহারী কোন্ অলক্ষ্য অব্যর্থ শক্তি দ্বারা তাহার সর্ব্বনাশ ঘটাইবেন,—তাহার অর্থ, সামর্থ্য ও প্রভুত্ব অতল জলে ডুবাইবেন,—আশাপূর্ণ হৃদয়ে সেই প্রতিহিংসা মনে মনে জাগাইয়া রাখিয়াছিল। প্রমথ—বিপুলবিত্ত ও ভূসম্পত্তির অধিকারী,—ধর্ম্মদ্রোহী ঈশ্বর-অবিশ্বাসী পরপীড়ক নাস্তিক, আধুনিক চাক্‌চিক্যময় সভ্যতায় ও কূট কৌশলপূর্ণ কথার মিষ্টতায়,—কখন বা সত্য সত্যই দুই একটা সাধারণ লোকহিতকর কার্য্যে,

সমাজে আপন প্রতিপত্তি ও সম্ভ্রম কোন প্রকারে বজায় রাখিয়াছিল বটে, কিন্তু ক্রমেই লোকে তাহাকে চিনিয়া ফেলিল। তাহার পাটোয়ারি-বুদ্ধি ও ধর্ম্ম-জ্ঞান জানিয়া লইল। তাহার সকল কার্য্যই অবিশ্বাস ও সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিল। এমন কি, অসাক্ষাতে তাহাকে বাপান্ত ও চৌদ্দপুরুষান্ত ভিন্ন কেহ জলগ্রহণ করে না।

সেই গুণধর প্রমথনাথ—মন্মথর বড় ভাই—জমিদার প্রমথনাথ,—এখন তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য হইল, কোনরকমে মারপেটের ভাই—কনিষ্ঠ মন্মথর সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি হস্তগত করা। কেননা ষোল-আনা বিষয় ও ভূসম্পত্তির মালিকানা-স্বত্ব হস্তগত না হইলে পল্লীর মধ্যে তাঁহার একাধিপত্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে না। তাই কোন রকমে সহোদরকে পথে বসাইতে তাঁহার দুর্জ্জয় বাসনা ও দুরাকাঙ্ক্ষা মনে জাগিল। অধীন অনুচর বা তোষামদজীবী কোন চাটুকার, অথবা কোন নিরক্ষর অজ্ঞ রেয়ৎ-প্রজা দ্বারা

কোনরূপ হাঙ্গাম-হুজ্জুৎ বা দাঙ্গা-ফ্যাসাদ অথবা ফৌজদারী-ফেরেক্কা বাধাইলে উভয় পক্ষেরই অর্থ-ব্যয় এবং শক্তি ও সময়ক্ষয়,—অধিকন্তু আদালতের বিচারে তাহার ভালমন্দ দুই-ই হইতে পারে ভাবিয়া, গুণধর পুরুষ একরূপ নির্ঝঞ্ঝাটে ও সহজ উপায়ে মনের মানস সাধিতে সচেষ্ট হইলেন। তাহারই ফলে সোহিনীর সহিত তাহার ভাব করিতে হইল। সোহিনীকে সম্পূর্ণরূপে হাত করিতে তাহার ধর্ম্মনষ্ট অবধি করিতে হইল! প্রবল ইন্দ্রিয়তাড়নায় বা তজ্জন্য চিত্তবিকারহেতু নয়,—কেবলমাত্র মতলব সিদ্ধির আশায়, এই কূটকৌশল আশ্রয় করিতে হইল। তখন তাঁরও একটু যৌবন ছিল, বালবিধবা অসহায়া সোহিনীরও ভরা যৌবন,—সুতরাং সহজেই তাহা জমিয়া গেল। কিন্তু পাপিষ্ঠের আসল লক্ষ্য রহিল অন্যরূপ—ক্রমে সোহিনীও তাহা বুঝিতে পারিল। সেই কথাই এখন বলিব।

সোহিনীর একটী ছোট বোন্ ছিল, কপালদোষে

সেও বালবিধবা হইল। শুধু বালবিধবা নয়,—একরূপ বাসরবিধবাই হইল। যখন জন্মের মত তার সিঁথীর সিঁদূর মুছিল, তখন তার বয়স—মাত্র নয়। কিন্তু সেই নয় বছরেই তার রূপে দিক আলো করিত! এই বালিকাই সেই মোহিনী।—এখন পূর্ণযৌবনা—শীকারসন্ধানতৎপরা—ক্রীড়া-কলানিপুণা সর্পিণী!

মোহিনীকে সোহিনী বড়—বড় ভালবাসিত। মারপেটের বোনের ভালবাসা বলিলে ঠিক সে ভালবাসা বলা হইল না। মা যেমন আপনার সকলের ছোট—কোলের মেয়েকে ভালবাসেন সোহিনী মোহিনীকে ঠিক্ সেই মত ভালবাসিত। তাহাকে আদর দিয়া, স্নেহ দিয়া, হৃদয়ের যত্ন দিয়া, প্রাণের সবটা মমতা ঢালিয়া দিয়া, সে তাহাকে ভাল-বাসিত। কিসে মোহিনী ভাল থাকিবে, ভাল খাইবে, ভাল পরিবে, সে সর্ব্বদা সেই যত্ন আয়ত্ত করিত। ক্রমে মোহিনী যখন বড় হইল, আপনার

সুখদুঃখ বুঝিল, দিদীর সুখদুঃখ বুঝিল, সংসার একটু একটু চিনিল, তখন জানিতে পারিল, সয়তানের ছলনায় ও প্ররোচনায়, প্রলোভনে পড়িয়া, তাহার দিদী—তার অমূল্যধন কাণাকড়িতে বেচিয়া ফেলিয়াছে!

তাই মোহিনী প্রথমে খুব সুপথেই চলিল। যাহাতে কোনরূপ ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য বা চিত্তবিকার না হয়, তজ্জন্য খুব সাবধানেই চলিতে লাগিল। বিশেষ চেষ্টা করিয়া—প্রলোভন ও সর্ব্ববিধ পাপ হইতে দূরে দূরে রহিল। কিন্তু হায়! অলক্ষ্যে—দূর হইতে তাহার নিষ্ঠুর অদৃষ্ট,—তাহাকে নিষ্ঠুর উপহাস করিল। ব্যাধের বংশীধ্বনি শুনিয়া প্রাকৃতিক নিয়মবশে দুর্ব্বল হরিণী যেমন আকৃষ্ট হয়, অভাগিনী মোহিনীও যেন ঠিক্ সেইভাবে আকৃষ্ট হইল। তাহার হৃদয়ের উপর দুর্জ্জয় দুরন্ত রিপু প্রবলরূপে ক্রীড়া করিতে লাগিল। তবে তার জন্মান্তরীণ সুকৃতিবশে, সে তার সতীধর্ম্ম একেবারে

নষ্ট করিল না,—মনের মন্দিরে তার বাঞ্ছিত প্রণয়াস্পদের মনোরম মূর্ত্তি গড়িয়া নীরবে তাহার পূজা করিতে লাগিল। সুঠাম সুন্দর সহৃদয় মন্মথই তার এই বাঞ্ছিত প্রয়ণাস্পদ।

কিন্তু হইলে কি হয়,—সম্মুখে পর্ব্বতপ্রমাণ বাধা,—পথ অতি দুর্গম। তাহার মন-মত ধন তার লাভ হয় কিরূপে?

মনে মনে সকলেই সকলকে চিনে। একটু মেলা-মেশা করিলেই চিনে। ভালোর দিক্‌টা না চিনুক, মন্দের দিক্‌টা উত্তমরূপেই চিনে। কার কোন্ খানে ব্যথা, পাপ, ছিদ্র, অথবা দুর্ব্বলতা,—আপন মন দিয়াই চিনিয়া লয়। সে চেনার কথা কাহাকে বলিয়া দিতে হয় না,—প্রাকৃতিক নিয়ম-বশে আপনা হইতেই তাহা মিলিয়া যায়। বিশেষ পরস্পরের মধ্যে যদি একটু আন্তরিক সহানুভূতি, সৌহার্দ্দ, স্নেহ বা মমতা থাকে, তা হইলে ত আর কথাই নাই,—খুব শীঘ্র ও সহজে তাহা জমিয়া যায়।

সোহিনী ও মোহিনীর মধ্যে ঠিক্ তাহাই হইল। সোহিনী আপন মন দিয়া মোহিনীকে দেখিল। মার পেটের সব্বার ছোট বোন্,—মায়ের কোল-চাঁচা মেয়ে,—বয়সে দশ বৎসরের ছোট,—একরূপ মেয়ের বয়সী,—বড় স্নেহের, বড় আদরের বোন্,—তাহার সুখদুঃখ, আকাঙ্ক্ষা আশা, তৃপ্তি ও অনাস্বাদ,—সোহিনীর মর্ম্মে মর্ম্মে জড়িত রহিল। অধিক কি, হতভাগিনী যখন উদ্দীপ্ত কামনানলে আহুতি দানস্বরূপ অপনাকে পিশাচ প্রমথর উপভোগে উৎসৃষ্ট করিল,—অথবা নিজেই সে বহ্নিমুখে ঝাঁপাইয়া পড়িল,—তখনো প্রবল সহানুভূতিবশে এক একবার ভাবিল, 'হায়! অনাঘ্রাতা কুসুমকোমলা মোহিনী আমার—এ সুখে বঞ্চিত হইবে?'—যৌবনোন্মুখী মোহিনীও তখন নবোদিত তরুণ অরুণের ন্যায় ধীরে ধীরে আপন স্বভাব-জাত লাবণ্যরশ্মি ছড়াইয়া দিক আলো করিতেছিল।

কিন্তু তখনো সে সরলা বালিকা। মন্মথের

ফুল-শর কি, জানে না। সংসারের কুটিলতাও তাহার সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। তবে মানুষ মানুষকে নষ্ট করে। আপনার জন আপনার জনের মাথা খায়।—হিংসাবশেও যায়, অন্ধ স্নেহবশেও খাইয়া থাকে।

এ ক্ষেত্রে সোহিনীই মোহিনীর মাথা খাইল। অতি বড় দরদী অথবা মরমের মরমী হইয়াই তাহার ইহকাল-পরকাল নষ্ট করিল। নিজের মুখ পুড়িয়াছে বলিয়া দোসর করিবার জন্য নয়,—প্রাণের মোহি-নীর কল্পিত কষ্টে কাতর হইয়া,—আপন মনের বাসনা মনে সৃজন করিয়া, হতভাগিনী আপনার প্রাণাধিকা স্নেহময়ী ভগিনীকে অনঙ্গের ক্রীড়া-পুত্তলি করিতে সচেষ্ট হইল।

ক্রমে মোহিনীও ইহা বুঝিল। বয়সের ধর্ম্মে ও সংসর্গের পরাক্রমে বুঝিতে পারিল। বুঝিতে পারিল, যে আপাতমধুর দৃশ্যে ভুলিয়া তাহার দিদী—কাল-ভুজঙ্গের করাল গ্রাসে পতিত, মোহবশে

হতভাগিনী তাহাকেও সেই পথে লইয়া যাইতে চায়!

কিন্তু বয়সে বড় হইলেও সোহিনী অপেক্ষা মোহিনী অধিক বুদ্ধিমতী। আপনার মনের উপরও সে বিশেষ আধিপত্য করিতে পারিত। তাই কামনার খরস্রোতে কূটার ন্যায় ভাসিয়া না গিয়া, সে দূর হইতে, কূলে দাঁড়াইয়া, লালসার এই মত্তকর অভিনয় দেখিতে লাগিল।

কিন্তু হায়! চোখের দেখায়ও নেশা আসে। সে নেশা মনে মিশিয়া যায়। ক্রমে, মনের নেশা হইলে—তাহার প্রভাব বড় ভয়ঙ্কর হইয়া থাকে। তখন জাতি কুল মান প্রাণ কিছুই জ্ঞান থাকে না,—যেরূপে হোক্ বাঞ্ছিতের সহিত বিহার করিতে উৎকট অভিলাষ জন্মে। সে অভিলাষ পরিপূরণার্থ সে সকলই করিতে পারে।

কার্য্যকারণ সূত্রে, ঘটনাপরম্পরায়, মোহিনীর ঠিক্ এই—ভাবের নেশা আসিল। সে নেশায় সে

আচ্ছন্ন হইল। তাহার বুক জুড়িয়া—বুকের সবটা স্থান অধিকার করিয়া—সহৃদয় মন্মথর মধুরমূর্ত্তি ধীরে ধীরে অঙ্কিত হইয়া গেল।

মন্মথ প্রমথ অপেক্ষা অনেক ছোট, এমন কি, মোহিনী অপেক্ষাও তিন বৎসরের ছোট; প্রকৃতি অতি মধুর, সর্ব্বাংশে প্রমথ হইতে বিভিন্ন,—সহৃদয়, পরদুঃখকাতর, সৌন্দর্য্যপ্রিয় ও ধর্ম্মভাবময়। তাহার উপর কাব্য ও কলাবিদ্যায় তাহার হৃদয়ের উদারতা বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছে। অনিন্দ্য-সুন্দর রূপ, প্রকৃতিদত্ত স্বাস্থ্য, অগাধ বিষয়সম্পত্তি,—বিধাতা সর্ব্বাংশেই সুখী করিয়া তাঁহাকে সংসারে পাঠাইয়াছেন।

কিন্তু অতি অল্প বয়সেই তিনি পিতৃমাতৃহীন হন, একমাত্র মাতৃস্থানীয়া বিধবা ভগিনীর যত্নে ও ভ্রাতৃজায়ার সেবা-শুশ্রূষাগুণে তিনি মানুষ হন,—গুণধর অগ্রজ প্রমথনাথ চিরদিনই স্নেহমায়া দয়া-মমতা বর্জ্জিত।

সুখে দুঃখে শৈশব কাটিল, কৈশোর অতিবাহিত হইল, যৌবনের প্রথম সোপানও উত্তীর্ণ হইয়া গেল, —এইবার বড় বিষম সাংঘাতিক কাল আসিল। ধনীর সন্তান, প্রচুর অর্থব্যয়ে গৃহেই সকল বিদ্যার একটু আধটু মহলা চলিল, ইংরেজী কাব্য সাহিত্য কিছু আয়ত্ত হইল, কিন্তু সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যায় তাঁহার সমধিক অনুরাগ জন্মিল। তাহার ফলে, প্রচুর অর্থব্যয়ে, নানাবিধ যন্ত্রপাঁতি সংগৃহীত হইল, এবং এক একটি ছোটখাট তানসেন ও রাফেল তাঁহাদের গৃহে বিরাজ করিতে লাগিলেন।

বড়টির বিদ্যাবুদ্ধি যত না হউক, পাটোয়ারী বুদ্ধিটি বিলক্ষণ রূপই হইল। পরের জমিজমা কৌশলে কাড়িয়া লইতে, দায়ে ঘায়ে কাহাকে কিছু সাহায্য করিয়া তাহার দশগুণ আদায় করিতে, বিধবা বেওয়ার গচ্ছিতধন বেমালুম হজম করিতে, অধর্ম্মে ও অন্যায় ব্যবহারে অন্যের উপর আধিপত্য-স্থাপন করিতে,—এইরূপ যত কিছু কুকার্য্য ও

কঠোরতা আছে,—সকল বিষয়ের প্রভু সাজিতে তিনি বিলক্ষণ তৎপর।

ঠিক এই সম-সময়ে সুচতুর প্রমথ মন্মথর মাথা খাইতে, এক কূট কৌশল উদ্ভাবন করিল। পুরাতন ভাবের লোক সোহিনীকে দিয়া সেই কৌশল—কার্য্যে পরিণত করিতে সচেষ্ট হইল। তাই একদিন সোহিনীকে গোপনে ডাকাইয়া নানা-ছাঁদে পুরাণো ভাবের কথা তুলিয়া, একটু একটু করিয়া তাহার মন অধিকার করিতে লাগিল। হত-ভাগিনী সোহিনী, পাটোয়ার পুরুষরত্নকে বিধিমতে চিনিলেও আপন অদৃষ্টদোষে, তাহার নিকট পরা-জিত হইল। ঠিক্ তাহার নিকট নয়, আপন প্রকৃতি-সুলভ দুর্ব্বলতার নিকট পরাজিত হইল। সে দুর্ব্বলতাটি তার নারীধর্ম্মের বিলোপ ;—পরপুরুষের সংসর্গলোলুপতা। হায়! লোভে, মোহে ও ইন্দ্রিয়-তাড়নায় হতভাগিনীর সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

তুখোড় খেলোয়াড়্ প্রমথ তাই আপন দুরভি-

সন্ধি সিদ্ধির আশায় পাঁচ কথা ফেলিয়া—তাহার সহিত ভাবের দোকানদারী করিতে লাগিল। বলিল, "সোহিনী, তুমি আমায় আর যা মনে কর, কিন্তু সত্যই আমি তোমায় ভালবাসি। তোমার রূপের লহর আজও আমার বুকের ভিতর লুকোচুরি খেলিতেছে।—মাইরি ভাই!"

মনে অপ্রত্যয় করিলেও সোহিনী পোড়ারমুখী আবার এ মোহে মজিল। মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার অতৃপ্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম সজীব, সতেজ ও জাগরিত হইয়া উঠিল। যেন বহুদিনের ক্ষুধা, সম্মুখে সুখদ ভোজ্য প্রস্তুত দেখিয়া, হর্ষে ও উল্লাসে নৃত্য করিতে লাগিল। পাপিষ্ঠের পাপ প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া হতভাগিনী হর্ষজড়িত গদগদস্বরে কহিল, "তা এ জন্যে আর দিব্বি-দিপান্তরের প্রয়োজন কি? — আমায় কি করিতে হইবে বল।"

"সত্যি বোল্‌চি সোহিনী, তোমার মুখখানি বড় মিষ্টি, বড় কচি।—আজও যেন তুমি বালিকা।"

হতভাগিনীর যৌবন-নদীতে তখন ভাঁটা লাগিয়াছে ; সেও তাহা বুঝিয়াছে। তা সত্ত্বেও গুপ্ত-প্রণয়ী তার রূপের প্রশংসা করিতেছে শুনিয়া, সে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। মুচ্‌কি হাসি হাসিয়া বলিল, "আর তোমারও কি বয়স গিয়েছে রসময় ?"

এইরূপ ইতর রসাভাস ও নিকৃষ্ট প্রণয় সম্ভাষণাদির সহিত, সেই নির্জ্জন প্রমোদকক্ষে, অনেক দিনের পর, পিশাচ পিশাচীর পাপের এক অঙ্ক অভিনীত হইয়া গেল।

পোষা পাপ আবার ছাড়া পাইল। তাহার তেজ বড় ভয়ঙ্কর হইল। পাপের প্রতিফল ফলিবার সমসময়ে এইরূপই হইয়া থাকে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এইবার মত্‌লবী প্রমথ আসল কথা পাড়িল,—"সোহিনি, তোমার না একটি ছোট বোন্ আছে?"

"হাঁ।"

"তার নাম না মোহিনী?"

"হাঁ।"

"তা তোমাদের নাম দুটি মানিয়েছে ভাল,—সোহিনী আর মোহিনী।"

"মা আদর কোরে ঐ নাম রেখেছিলেন।"

"তা মোহিনীর সঙ্গে আমাদের বিধুর না বড় ভাব?

বিধু প্রমথের মধ্যমা ভগিনী; বয়স্থা বিধবা; সচ্চরিত্রা স্বধর্ম্মপরায়ণা। মোহিনী একটি নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "ভাব আর কি বল,—তিনি ভাল-বাসেন, দয়া করেন, আপনার মেয়ের মত দেখেন; কিন্তু——"

"বলিতে বলিতে থামিলে কেন? কিন্তু—কি?"

"কিন্তু পোড়ালোকের কাণ-ভাঙ্গানিতে তিনিও আমাদের উপর বিরূপ হোয়েছেন। মনের দুঃখে মোহিনী আর ও-বাড়ীর ত্রিসীমানায় যায় না।"

"কেন, কেন, হোয়েছে কি? বড় বউ কি তাকে কিছু বোলেছে? আমাদের বাড়ীর চাকর-চাক্‌রাণীরা কি তার কোন অপমান কোরেছে?"

"ঠিক্ তা নয়, তবে মোহিনী আমার বড় অভিমানিনী; কেউ কিছু বলা দূরে থাক্, মুখের একটু বক্রদৃষ্টি, চোখের একটু তাচ্ছিল্য ভাবই তার পক্ষে যথেষ্ট।"

"কেন? এরূপও হোয়েছে নাকি?"

"ঠিক্ বোল্‌তে পাল্লুম না, মোহিনীও আমায় কোন কথা ভাঙ্গেনি ; তবে তার ভাব-ভঙ্গি দেখে তাই মনে হয় বটে।"

"আচ্ছা, মন্মথ কি তাকে কিছু বোলেছে? কোন অপ্রিয় প্রসঙ্গে——"

সোহিনী বাধা দিয়া পুনরায় একটি নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "তিনি দেবতা ; তাঁর সম্বন্ধে কোন কথা শত্রুতেও বোল্‌তে পারে না।"

"হুঁ,—তবে?"

"আমাদের অদৃষ্ট।"

নিষ্ঠুর প্রমথ একটু নিষ্ঠুর হাসি হাসিয়া কহিল, "না সোহিনি, মোহিনীর মত যার ভগিনী আছে, তাদের অদৃষ্ট কখন মন্দ হোতে পারে না।"

"কি ভাবে তুমি এ কথা বোল্‌চো?"

মনে মনে কহিল, "এ পিশাচের পাপ-চক্ষু কি সে সরলা বালিকার উপর পোড়েছে?"

প্রমথ পুনরায় সেই ভাবে বলিল, "যে ভাবেই

বলি, স্থির জেনো, তোমার ভগিনীর বড় জোর-কপাল। অমন সুর-সুন্দরী নরলোকে দুর্লভ।”

“আজকাল তুমি কি তাকে দেখেছ?”

“আজকাল না দেখি,—উঠন্ত গাছের বাড় চারা-বেলায় বোঝা যায়।”

“এ রূপক-হেঁয়ালি রেখে, তোমার আসল মনের কথা কি—বলো দেখি?”

“বোল্‌ছিলেম কি, মোহিনী আর মন্মথয় মানিয়েছে ভাল।”

“ও আবার কি কথা?”

“কেন, তুমি কি তা জানো না—যে, মন্মথ এ জন্মে বিয়ে অবধি কোর্‌লে না?”

“বিয়ে কোর্‌লেন না কি এই জন্য?”

“তা বৈ আর কি? আদর্শ সৌন্দর্য্য খুঁজে, নায়িকা নায়িকা কোরে, ওর মাথা বিগ্‌ড়ে গেছে। কেবল মাথামুণ্ড কেতাবের বুলি, ছবি-তোলা, আর একটু-আধটু গাওনা-বাজনা—এই নিয়েই একরকম

জীবনটা কাটালে।—না দেখে বিষয় আশয়, না দেখে ঘর্ সংসার, না দেখে কোন কিছু।"

"তা আমায় এখন কি কোত্তে হবে বলো।"

এবার পাটোয়ার পুরুষটি বুদ্ধির তূল-দাঁড়িতে মনের মতলব ওজন করিয়া, এদিক ওদিক খতাইয়া, নানারকমে মোহিনীর মন-রাখা কথা কহিয়া, শেষ বলিলেন, "এখন তুমি ভাই কোন রকমে এই যোজনাটি করিয়া দাও। মন্মথ আর মোহিনীর মনের ভাব—মুখে কাজে এক কর। ও শুধু ফাঁকা ফাঁকা দীর্ঘশ্বাস—আর মন-মজানো কথায় কিছু হবে না,—সত্যি সত্যি দুই হাত এক কর।"

"কি কোরে তা হবে? ছোট বাবু তো বিয়ে কোত্তে আদৌই চান না?"

"এইটে আর বুঝ্‌লে না চাঁদ?"—বলিয়া, একটু চুয়াড়ে হাসি হাসিয়া, গুণধর পুরুষ কহিলেন, "পবিত্র প্রণয় জমাট বাঁধাইতে একটু একটু অষুধ ধরাও।"

"অযুধ আবার কি?—এতও জানো?"

"মদ, মদ! মদের মত্ততা না আসিলে ভাবে জমাট বাঁধিবে না! ঐ পরকাল, ঈশ্বরতত্ত্ব, কর্ম্মফল,—ভায়ার এই যে সব কত্তকগুলো ভাবের ঢেউ আছে,—কোন রকমে মদ না ধরাইতে পারিলে, ও ঢেউ ভাঙ্গিবে না,—তোমার ভগিনীরও রাজরাণী হওয়ার সাধ—মনেই রহিয়া যাইবে।"

সোহিনী, মত্‌লবী প্রমথর মনের ভাব কিছু কিছু বুঝিলেও, তার সবটা চক্রান্ত জানিয়া লইবার জন্য বলিল, "তা আমার ভগিনীর রাজরাণী হওয়ার জন্য তোমার অত মাথাব্যথা কেন?"

একটু মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে গুণধর উত্তর দিলেন,—"তুমি কথাটা তলিয়ে বুঝ্‌লে না দেখ্‌চি। —এই, তোমাকে আমি যেমন প্রাণের সমান ভাল-বাসিয়াছি, ভায়াও যদি তোমার ভগিনীকে সেইরূপ ভালবাসে, তাহ'লে আর পাঁচ বেটায় কোন কথা কানাকানি কোত্তে পারে না।—বেশ নির্ঝঞ্ঝাটে

পবিত্র প্রণয় জমিয়া যায় ; আর তোমাদেরও একটা চিরদিনের হিল্লে হয়। সত্যি কথা বোল্‌তে কি, মন্মথর মুখ চেয়ে, ইচ্ছাসত্ত্বেও আমি আজ পর্য্যন্ত তোমাদের কিছু কোত্তে পারি নে। যতই হোক, এজ্‌মালি সম্পত্তি ;—শেষ কি ভায়ে ভায়ে একটা মনান্তর বাঁধ্‌বে ?”

মনে মনে কহিল, “একবার কোন রকমে জালে ফেল্‌তে পাল্লে হয়।—হুঁ, মদ আর মেয়েমানুষ —এই দুই নেশায় যদি মন্মথ মজে, তবে ওর ঐ অর্দ্ধেক অংশ লিখিয়ে নিতে কতক্ষণ ?”

মোহিনী ভাবিল, “উঃ! কি সয়তানি! মারপেটের ভাইকে বঞ্চিত কোত্তে নরাধমের এই কূট কৌশল!”

প্রকাশ্যে কহিল, “তা এ কাজ তো আর জোরে হয় না ?—এতে আমার হাত কি বলো ?”

মদ্যপ পিশাচ এবার খুব ঘোরালো করিয়া তাহাকে বুঝাইল—“মোহিনি, তবে সব কথা তোমায় খোলসা করিয়াই বলি। তোমার ভগিনীকে

বুঝিয়ে বলো, সতীপনাটা একটু কমিয়ে আগে মন্মথকে হাত করুন! বয়স গেলে কি আর ও জোম্‌বে? একবার জমিয়ে নিয়ে তারপর যত খুসী—মান অভিমান, রাগ রোষ, কথা কাটাকাটি—এমন কোর্‌লে কোন ক্ষতি হবে না। বুঝ্‌লে? আর ঐ জমাটের মুখে দু'এক খানা বাড়ী, কিছু কোম্পানীর কাগজ, আর গহনা টহনা যা কিছু কোরে নিতে পারো। বলি, বাঁচ্‌তে তো হবে গো? আমি এ বিষয়ে তোমার প্রধান সহায় রইলেম জেনো।—যখন যে কিছুর বরাত হবে, আমায় জানিয়ো। মোদ্দা কথা, শীগ্গির শীগ্গির জোটপাট খাইয়ে দাও,—দূতীগিরির কাজটা ভালো কোরে করো।"

"হুঁ।"—মোহিনী আর কিছু না বলিয়া, সে দিনের মত বিদায় চাহিল। মনে মনে বলিল, "উঃ! কি ভয়ানক! মার পেটের ভাই—এমন নর-রাক্ষস হয়? আচ্ছা, আমিও দেখে নেবো।"

সোহিনী চলিয়া গেল। গুপ্তদ্বার দিয়া হত-ভাগিনী প্রস্থান করিল।

পিশাচ প্রমথ সেই পাপ কক্ষের বারান্দায় পায়চালি করিতে করিতে ভাবিল, "হ্যাঁ, যেমন কোরে হোক্, এটা কোত্তেই হবে;—মন্মথকে মজিয়ে—তার সব হাত কোত্তে হবে। নইলে ও একটা লেঠা—জন্মের মত রোয়েই গেল, মনের সাধে আর সম্পত্তি ভোগ কি প্রভুত্ব করা যাবে না! শক্তির একাধিপত্য না হোলে আর হোলো কি? হায়! যদি বাপ মায়ের একমাত্র সন্তান হোতেম?—তলে তলে দেখেছি, খবর নিয়েছি, ছুঁড়ীটে ভারি খেলোয়াড়!—ধরা দেয় দেয় দেয় না। ভায়াটিও, আমার একটি মেয়ে মানুষের মধ্যে—কেবলি কাব্য আর পরকালতত্ত্ব! হুঁ, মনের মধ্যে যে মোজেছে, তার আর সন্দেহ নেই,—তবে ঐ আটাকাটিতে আজও পড়েনি, এও ঠিক্।—সোহিনীই এখন যদি এটা কোরে দেয়! তা দিলেও দিতে পারে।

ও লোভাত্বে জাত ;—যে লোভ দেখিয়েছি,—যে আকাশের চাঁদ হাতে দেবো বোলেছি, ওতে যদি রাজী হয় ! ভায়াটি যে আমার বড় লাজুক ; নইলে কি আর এ গুপ্ত প্রেমের জন্যে পরের উপাসনা কোত্তে হয় ? যাই হোক্, শীঘ্রই একটা হেস্তনেস্ত কোত্তেই হোচ্চে,—নইলে মন আমার শান্ত হোচ্চে না।—দেওয়ান বেটা আবার এ সময় মোত্তে আস্‌চে কেন ?—কি খবর কি ?”

দেওয়ান দণ্ডবৎ করিয়া জোড়হস্তে জানাইল,—“হুজুর,উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে,ছোটবাবু হাজার টাকা চাঁদা দিতে হুকুম দিয়েছেন, তাই আপনাকে জানাতে এসেছি। টাকাটা কি সরকারী খাতায় খরচ পড়িবে?”

“তোমার মাথা পড়িবে”—মনে মনে এই কথা বলিয়া পাটোয়ার পুরুষ প্রকাশ্যে কহিলেন, “হাঁ তাহাই এখন পড়ুক, তবে জিগির দিয়ে ওটা লিখিয়া রাখ,—যে এই বাবদ।” “যে আজ্ঞা” বলিয়া দেওয়ান প্রস্থান করিল।

প্রমথ ভাবিতে লাগিল, "এই রকম সব লেঠা, —দিন দিনই এমনি আপদ বালাই! আরে, টাকা কি খোলার কুচি!—যে দান খয়রাৎ অমনি মুখে লেগেই আছে? দুর্ভিক্ষ,—তা আমার কি? আমি কত ফিকির-ফন্দি কোরে গুপ্ত তবিল ভরাচ্চি, —নগদ ক্যাস কোচ্চি, আর ভাইটির আমার ঐ যত সব বেয়াড়া বুঝ্!—আজ এর পিতৃদায়, কাল ওর মাতৃদায়, পরশু তার কন্যাদায়—এই রকম কোরে তিনি বিষয়টি উড়িয়ে দিয়ে যাবেন ভেবেছেন। উঁহুঁ, সেটি হোচ্চে না। ন্যাকা সেজে এখন আমি ওঁর যত দান খয়রাৎ সরকারী খাতায় লেখাচ্চি বটে, এর পর কিন্তু সুদশুদ্ধ পাই পয়সা বুঝেপোড়ে নেব। বিশ্বাসটা এখন এই রকম কোরে জমিয়ে নেই! তারপর বোঝাপড়া! বিয়ে কোর্ল্লেন না,—তবে আর কি? অতই যদি দীল্‌দরিয়া মেজাজ, তবে ভাইকেই সব লিখে দেনা কেন বাপু? কি বোল্‌বো, বড় বউয়ের যে একটা ছেলে হলো

না? তা হোলে সেই ছেলের মুখ দেখিয়ে, ওর মন ভুলিয়ে, সব হজম কোরে ফেল্‌তেম। ওর ঐ কবিত্বময় প্রাণ,—শিশুর হাসি দেখিয়ে নিশ্চয়ই গলিয়ে ফেল্‌তেম।—কিন্তু যে কারণেই হোক, তাতো হোলো না।—এখন ঐ মোহিনী কুহকিনী বা মায়া-রঙ্গিণীকে দিয়ে আমার মত্‌লব সাধ্‌তে হবে। দেখি, মোহিনী কতদূর কি কোত্তে পারে। শেষ না হয়—আর এক চাল্‌ চাল্‌বো।"

কিন্তু মূর্খ পাটোয়ার! তোমার ঐ অতি-বুদ্ধির গলায় দড়ি! পয়সা ও প্রভুত্বই তুমি চিনিয়াছ,—কূট কৌশলই তুমি বুঝিয়াছ;—কিন্তু রমণীহৃদয়ের রহস্য তুমি কি বুঝিবে? রূপ দেখিয়া যে মজিয়াছে,—গুণ দেখিয়া যে ভুলিয়াছে, তাহাকে তুমি ধনের প্রলোভনে হস্তগত করিবে? রূপ ও গুণ তপস্যালব্ধ ঐশ্বরিক সম্পত্তি; ধন—হাতের মলা। সেই মলা

দিয়া তুমি মনুষ্যত্ব রূপ অমূল্য মাণিক ক্রয় করিবে ?—অসম্ভব। স্থানবিশেষে সম্ভব হইলেও, এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই অসম্ভব।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সত্যই সহৃদয় মন্মথর রূপ ও গুণ দেখিয়া মোহিনী পোড়ারমুখী মজিয়াছে,—তাঁহার অগাধ অর্থ বা ঐশ্বর্য্য সম্পত্তির দিক্ দিয়াও সে যায় নাই। বণিকবৃত্তি হৃদয়ে পোষণ করিলে এতদিনে সে পল্লীবিশেষে স্থান পাইত,—অনেক বড় মানুষের ছেলেকে মজাইয়া জুড়িগাড়ী চড়িয়া বেড়াইত। কিন্তু সে ধাত তার নয়, সে পৈশাচিক রঙ্গরসে মাতিবার প্রবৃত্তি তাহার আদৌ ছিল না;—সে মনে মনে মন্মথকে ভাল বাসিবে, তাহাকে লইয়া খেলাইবে,—তাহার দেবোপম মূর্ত্তি মনের মন্দিরে গড়িয়া পূজা করিবে,—এই মাত্র সাধ। সে সাধে

সে বঞ্চিত হইতে চায় না,—শত সাধে জলাঞ্জলি দিয়াও তাহা হৃদয়ে পোষণ করে।

দুর্দ্দমনীয় রিপুর উত্তেজনা যে তাহার ছিল না, তাহা নয়। সে উত্তেজনা খুবই ছিল,—সে উত্তেজনার বশে এক এক দিন সে আত্মহারা হইত; দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয্যায় শুইয়া নীরবে এক একদিন কাঁদিত; অনাহারে ও অনিদ্রায় সারারাত সারাদিন তাহার অতিবাহিত হইয়া যাইত; এত সত্ত্বেও কিন্তু তার একটি অসাধারণ শক্তি ছিল, যাহাতে করিয়া আজ পর্য্যন্ত সে সমানে যুঝিয়া আসিতেছে। সেটি তার মানসিক শক্তি, ধৈর্য্য, ইন্দ্রিয়ের উপর আধিপত্য। মনে মোহিনী পতিতা হইলেও, মনের আর এক অংশে—দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয়নিগ্রহে সে অজেয়, অপরাজিত ছিল। শত সুবিধা, শত সংযোগ ঘটিয়াছে,—তথাপি সে আত্মগৌরবে গৌরবময়ী হইয়া, উপেক্ষার সহিত তাহা পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে।

মন্মথও তো সেইজন্য এই উদ্দাম অভিনব প্রেমে এত মুগ্ধ! সেই পূর্ণাবয়ববিশিষ্টা, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর-পরকীয়া রূপসীর রূপে—তাই তো তিনি এমনি উন্মত্ত!—যে, বিবাহ অবধি করিলেন না। আত্মীয় স্বজন বুঝাইল, বন্ধু বান্ধব অনুরোধ করিল,—বাজে কথা বলিয়া, আর একরূপ বুঝাইয়া, উড়াইয়া দিলেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, "এ জন্মে না হোক,—জন্মান্তরেও মোহিনীকে বুকে ধরিয়া, দুর্জ্জয় রূপতৃষ্ণা মিটাইব,—দ্বিতীয় রমণী এ হৃদয়ে স্থান পাইবে না!"

একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু তাঁহাকে বুঝাইল,—"তবে মোহিনীকে বিবাহ কর,—বিবাহ করিয়াই সুখী হও; সে হতভাগিনীও পরিত্রাণ পাক।"—উত্তরে রূপমুগ্ধ যুবা বলিল, "না, তাও পারিব না,—তাতে অন্যরূপ অন্তরায় আছে।"—"তবে কি করিবে ভাবিয়াছ? "ভাবিব আর কি?—এই ভাবে যতদিন যায়।" "হুঁ, বটে! তবে

মরো, গোল্লায় যাও।” “সেই চেষ্টায় আছি, তবে আর আগে একবার দেখিতে চাই, রূপের মনোময়ী মূর্ত্তি হৃদয়ে গড়িয়া, মনে মনে রূপের পূজা করিয়া, জীবনের বাকী কটা দিন কাটানো যায় কি না?” “তাতে কি লাভ?” “দেখিব, কোন অলক্ষ্য আকর্ষণী শক্তি আমায় নূতন করিয়া গড়িতে পারে কি না?” বন্ধু নিরস্ত হইলেন, মন্মথ লালসার মত্তকর অভিনয়ে স্বেচ্ছায় মনের মধ্যে তুষানল জ্বালিল।

এমন দু’একদিন নয়, দু’ একমাস নয়, দু’ এক বৎসরও নয়,—দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাল অতিবাহিত হইয়া চলিল,—মন্মথ কেবল চোখের দেখা দেখিয়া, মোহিনীর সহিত সরস মধুর মত্তকর প্রণয়ালাপ করিয়া, সুখে দুঃখে দিন একরূপে কাটাইয়া দিল। বলা বাহুল্য, ইহাও একরূপ ব্যভিচার। ‘একরূপ’ই বা বলি কেন,—ঘোর মানসিক ব্যভিচার। দৈহিক মিলন না হইলেও, অন্তরে অন্তরে ইহার

পূর্ণমিলন হইয়া যায়,—ইহার ফলও নিতান্ত সামান্য নয়।

সুদীর্ঘকাল ধরিয়া মন্মথ ও মোহিনী এই মানসিক ব্যভিচারে লিপ্ত রহিল। লোকচক্ষে ধূলি দিয়া, সমাজকে ফাঁকি দিয়া, তাহারা ঈশ্বরের বিধানে অমান্য করিয়া চলিল। তবে ধর্ম্মভীরু মন্মথ, মধ্যে মধ্যে সৎগ্রন্থ পাঠ করিত, সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গ লইত,—আরও পাঁচটা পুণ্যকার্য্য করিয়া চিত্তপ্রসাদ লাভে প্রয়াসী হইত। কিন্তু সর্ব্বদাই তার মনে প্রশ্ন উঠিত যে, 'উঠিতেছি,—কি পড়িতেছি ?'

মোহিনী পোড়ারমুখীও তার দিদীর পরিণাম দেখিয়া, যে কার্য্যের যে ফল বুঝিয়া, এইটুকুই সতর্ক হইয়া রহিল যে, দৈহিক হিসাবে সে নিষ্পাপ। —দেহের মিলন—মন্মথর সহিত—তাহার এক দিন—একমুহূর্ত্তও হয় নাই,—সে চেষ্টা বা সে ইচ্ছাও সে কখন করে নাই,—বরং তাহা হইতে সম্পূর্ণ তফাতে থাকিত। ডম্বুরিধ্বনি শুনিয়া করাল

কালসর্প যেমন গর্ত্ত হইতে মুখোত্তোলন করিয়া, তাহার বিচিত্র ভীষণ ফণা স্থির রাখিয়া, উৎফুল্লচিত্তে ধীরে ধীরে নৃত্য করে, মন্মথর মধুর মূর্ত্তি বা সুমধুর কণ্ঠস্বর দূর হইতে শুনিয়া বা দেখিয়া, সে সৌন্দর্য্য-ভূষণা সর্পিণীও সেইরূপ আহ্লাদে ও আবেশে—মনের মধ্যে নাচিতে থাকিত। সে মনের নাচ মুখে ফুটিত,—তাহার চক্ষু উৎফুল্ল হইয়া উঠিত,—অধরোষ্ঠ কম্পিত হইত, সঘন নিশ্বাস পড়িত। সূক্ষ্মভাবে দেখিলে আরো দেখা যাইবে,—সে সময় মোহিনী বা সেই মায়াবিনীর সূক্ষ্ম বসনাঞ্চল ভেদ করিয়া একটি রূপের লহর খেলিয়া যাইত,—বক্ষঃস্থল স্পন্দিত হইত,—সর্ব্বাঙ্গে পুলক বহিত।

রূপতৃষ্ণ মন্মথ আকণ্ঠ ভরিয়া মোহিনীর সে রূপ-সুধা পান করিত,—কখন বা তাহার অজ্ঞাতে ইহাপেক্ষাও উদ্দীপ্ত রূপশ্রী—কামানলে আহুতিপূর্ণ—মদিরাময় সৌন্দর্য্যচ্ছটা—গোপনে চোরের মত দেখিয়া লইত, এবং তাহা বাস্তব ও প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-

ভোগ অপেক্ষা অধিক সুখকর বোধ করিতে থাকিত, —কেন না কল্পনাবলে তাহা আরো অধিক করিয়া মনের মধ্যে দেখা যাইত এবং সেই মনের পূর্ণ উপভোগ—স্বেচ্ছায় ও নিরাপদে যতক্ষণ ইচ্ছা সম্ভোগ করিতে পারিত।

কালামুখী মোহিনী সম্বন্ধেও তাই। সে হতভাগিনীও অনেক সময় গোপনে,—কোন কিছুর অন্তরাল হইতে মন্মথর মধুর মনোহর অঙ্গ-ভঙ্গি দেখিয়া, কৃতার্থ হইল ভাবিয়া, সজলনয়নে চলিয়া যাইত, এবং মনে মনে অনেক ভাঙ্গাগড়ার কল্পনা করিয়া, হয়ত জন্মান্তরে সুখী হইতে পারিবে ভাবিয়া, হৃদয়ে নন্দনকাননের রচনা করিত। অথচ সময় ও সুযোগ, স্থান ও কাল—উভয়েরই অনেক সময় অনুকূল হইয়াছিল।

কেন এমন হইতেছে?—পরিণাম-চিন্তা, ধর্ম্ম-ভয়, আর দেবত্বে ও পশুত্বে সংগ্রাম;—এই তিন কারণে। মূল কিন্তু উভয়ের অদৃষ্ট ও কর্ম্ম।—

যেমন অদৃষ্ট লইয়া উভয়ে আসিয়াছে, যেরূপ কর্ম্ম উভয়ে করিয়া যাইতেছে, ফলও তো সেইরূপই হইবে ?

মন্মথর একখানি 'ফটো-চিত্র' মোহিনী কৌশলে হস্তগত করিয়াছে ; যখন বাঞ্ছিত নায়কের দর্শন-সুখে কোন অন্তরায় হয়, তখন মোহিনী কল্পনার শতচক্ষু বিস্তারের সহিত সেই সুন্দর সুঠাম চিত্রপট দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে থাকে। তাহাকে বুকে রাখিয়া, প্রেমচুম্বনে সোহাগ করিয়া সুখী হয়,—কখন বা তাহাকে অনিমেষ সজলনয়নে দেখিতে দেখিতে, মনের গুরুভার লাঘব করে। সুতরাং স্পর্শসুখ বা দৈহিকমিলন না হইলেও তাহার কোন কষ্ট ছিল না।

অপরপক্ষে মন্মথও এ সুখে বঞ্চিত হন নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কাব্য ও সঙ্গীতালোচনার সহিত চিত্রবিদ্যার সখ্‌ও তাঁহার ছিল। বাড়ীতে ফটো-গ্রাফের যন্ত্রপাতি আনিয়া ও নানারূপ তৈলচিত্রের

সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করিয়া, মধ্যে মধ্যে তিনি চিত্র-শিল্পের অনুশীলনেও মনোযোগী হইতেন। দশ বৎসর পূর্ব্বে যখন তিনি প্রথম ফটোগ্রাফি শিক্ষা করেন, সেই সময় বাটীর আত্মীয় পরিজনের প্রতি-মূর্ত্তি উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে, হঠাৎ একদিন বড় আকস্মিক ভাবে—তিনি তাঁহার গুপ্ত প্রণয়িনী মোহিনীর ছবি তুলিয়া ফেলেন। মধুর অপরাহ্নে, আপনাদের মনোহর পুষ্পোদ্যানের প্রাকৃতিক দৃশ্য উত্তোলিত করিবার আশায় তিনি যন্ত্রপাঁতি লইয়া উপস্থিত হইলেন,—অনুচরাদি সঙ্গে রহিল,—যথা-স্থানে সেই যন্ত্র স্থাপিত করিয়া,—যথানিয়মে তিনি সেই পুষ্পোদ্যানের ছবি তুলিলেন। কিন্তু, হরি হরি! ছবি তুলিবার সঙ্গে সঙ্গে, তিনি যে মধুর মনোহারিণী মূর্ত্তি চিত্রপটে দর্শন করিলেন, তাহাতে চমৎকৃত ও চির-আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন;—সহস্র চেষ্টা করিয়াও সে মোহিনীমূর্ত্তি তিনি ভুলিতে পারিলেন না!

চিত্র উত্তোলন কার্য্য সমাধা করিয়া, কৌতূহল-আশাপূর্ণ দৃষ্টিতে অবিলম্বে তিনি দেখিতে পাইলেন, স্থূল যন্ত্রের সাহায্যে, যাহার ছায়া-মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া তিনি পুলকপূর্ণ ও রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়াছেন, সেই মোহিনী-প্রতিমা মনোমোহিনী—অসামান্য রূপ ও লাবণ্যময়ী দীপ্তি ছড়াইয়া, সুঠাম কায়ামূর্ত্তিতে—তাঁহাদের পুষ্পোদ্যানস্থ পুষ্করিণী-সোপান আলো করিয়া, ধীরে ধীরে জল হইতে উঠিতেছেন !

চক্ষের দৃষ্টি পড়িল না,—মুহূর্ত্তকাল অনিমেষ নয়নে তিনি সেই লাবণ্যবতী লোকললামভূতা ললনাকে দেখিতে লাগিলেন। আর্দ্রবস্ত্রে, এলোচুলে, একরূপ অনাবৃত বক্ষে—তখনও সেই মনোরমা—সোপান অতিক্রম করিতেছিলেন !

হঠাৎ চারিচক্ষের মিলন হইল। লজ্জারাগ-রঞ্জিতা, অনাঘ্রাতা, মোহিনীসুন্দরী চমকিতভাবে মাথার কাপড় একটু টানিয়া, পুলকপূর্ণ চাঁদমুখে

একটু মধুর হাসি হাসিয়া, ধীর গজেন্দ্রগমনে প্রস্থান করিলেন।

কাব্যকলার আদর্শ-সৌন্দর্য্যে প্রাণ পরিপূর্ণ—নবীন যুবকের হৃদয়ের উপর দিয়া হঠাৎ যেন একটা তড়িৎ-প্রবাহ ছুটিয়া গেল। প্রাণ কেমন যেন এক অভিনব ভাবের হিল্লোলে নাচিয়া উঠিল!—মুহূর্ত্তমধ্যে তিনি অনেকদূর আগাইয়া পড়িলেন।

সঙ্গীদিগকে বিদায় দিয়া মন্মথনাথ সেই উদ্যান-কক্ষে নির্জ্জনবিহার করিতে লাগিলেন। সেই দিন—সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তাঁহার জীবনের সব যেন কেমন গোলমাল হইয়া গেল। এমন ভাবে, সম্পূর্ণ অনিশ্চিত অবস্থায়, এই তাঁহার প্রথম—সেই সৌন্দর্য্য-প্রতিমা সন্দর্শন। সে ছবি হৃদয় হইতে আর মুছিল না।

"হায়, কি দেখিলাম!"—মন্মথ ভাবিলেন, "দর্শনে যার এত সুখ, না জানি—ওঃ! বিধিসৃষ্ট সৌন্দর্য্যের বোধ হয় এই শেষ!—এর উপর আর

সৌন্দর্য্য থাকিতে পারে, এমন কল্পনাও হয় না।—সৌন্দর্য্যের সীমাবর্ত্তিনী—কে এ মনোমোহিনী? এই যদি—না থাক্, এ চিন্তা এখন করিব না।”

অল্প অনুসন্ধানেই জানিতে পারিলেন, এ অসামান্যা রূপসী—বালবিধবা, তাঁহাদেরই এক-জন—পরলোকগত প্রতিবেশীর কন্যা, নাম মোহিনী,—সোহিনীর ছোট বোন্।

সেই মোহিনী—যাহাকে বালককালে তিনি দেখিয়াছেন, এখন তাহার এই রূপ! তার উপর সে বিধবা!

যুবক ধীরে ধীরে একটি নিশ্বাস ফেলিলেন। মনে বড় আঘাত লাগিল। সমগ্র পৃথিবী যেন ঘুরিতে লাগিল। হায়, সেই মোহিনী বিধবা!—পরস্ত্রী! অনিন্দ্যসুন্দর রূপ, অনাঘ্রাত অবয়ব, নীটোল যৌবন!—বয়সে আবার সে তাঁর চেয়ে বড়—মৃদুহাসিনী,—বোধ হয় রসিকাও হইবে! মন্মথ অন্তরের অন্তরে তপ্তশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

নায়িকা বড়, নায়ক ছোট; রূপের হাটে, প্রেমের জমাট—কি ইহাতেই অধিক বাঁধে?

ঠিক্ বুঝাইতে পারিলাম না। কিন্তু কবি বলিয়াছেন,—"না হোলে রসিকা, বয়োধিকা, প্রেম জমে না!"

কিন্তু প্রেম জমুক আর না জমুক,—উদ্দাম ইন্দ্রিয়পরায়ণ ভোগলিপ্সু যুবক যুবতীর এইরূপ মিলনই বোধ হয় অধিক সুখকর হয়। ঠিক মজা বা মজিয়া যাওয়া এইরূপ আধারেই হইয়া থাকে।—তাই মন্মথ দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া জ্বলন্ত বহ্নিমুখে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

সেই দিন হইতেই সংগ্রাম—সমানে চলিয়া আসিতেছে। দিন নাই, রাত নাই, সময় নাই, অসময় নাই, ক্রমাগতই তিনি মনের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। সে যুদ্ধে হৃদয়ে ক্ষত বিক্ষত হইলেন, সংসারের সকল সুখে জলাঞ্জলি দিলেন, পৃথিবী তাঁহার নীরস, কর্কশ, কঠিন প্রস্তরবৎ বোধ হইল।

ক্রমে সে অবস্থা কাটিল। ধীরে ধীরে আশার মলয়-বায়ু সঞ্চালিত হইতে লাগিল। নির্জ্জন সাক্ষাৎ-সন্দর্শন, কথোপকথন, পরস্পরের মনোভাব প্রকাশ-করণ,—একে একে সবই হইল। হইল না কেবল,—বলিয়াছি—সেই তুচ্ছ দৈহিক মিলন, অথবা বাহ্যেন্দ্রিয়ের ক্ষণিক তৃপ্তি সাধন! কিন্তু আসল যা হইবার তা হইয়াছে,—উভয়ের মনের মিলন সম্পূর্ণ-রূপে ঘটিয়াছে। কিন্তু সেই সংঘটনের সহিত অশ্রান্ত সংগ্রাম। সংগ্রামেই সেই পাগলরূপী পরম-পুরুষের কৃপালাভ।

ফল কথা, এই চিত্র উত্তোলনকার্য্যই মন্মথর কাল হইয়াছে,—আর সেই চিত্রে প্রতিবিম্বিত মোহিনীর মোহিনীমূর্ত্তিই তাঁহার জীবনের সব উলট পালট করিয়া দিয়াছে! তারপর তিনি তাঁহার প্রিয়তমার কত রকমের কত ফটোচিত্র তুলিলেন,—কত চিত্র তাঁহাকে উপহার দিলেন,—তাহার সংখ্যা কে রাখে?

কিন্তু চিত্রই তুলুন, আর নায়িকার রূপই দেখুন, —আসল লক্ষ্য রহিল তাঁহার—ধর্ম্মের সেই কঠোর অনুশাসন।

নহিলে তিনিও ঘোর বিষয়ী ধনবান্ ব্যক্তির পুত্র; স্বয়ং পাটোয়ার প্রমথনাথের সহোদর; আর যৌবন-জুয়ার তাঁহার হৃদয়-নদীর কানায়-কানায় আসিয়া ঠেকিয়াছে;—উপ্‌চিয়া উঠিতে কতক্ষণ?

এমন জমাট প্রেম যার, সে কি তুচ্ছ অর্থের হিসাব নিকাশ রাখে? আর সেই প্রেম পাইতে, যে কতদিন ধরিয়া কতরূপ লীলা-চাতুরী দেখাইয়া আসিতেছে,—একরূপ যৌবন ক্ষয় করিয়া ফেলিয়াছে,—সে কি টাকার লোভে আপন বাঞ্ছিত ধনকে বিপথে ফেলিতে পারে?

ছি, প্রমথনাথ, ছিঃ! যেমন মন লইয়া তুমি জন্মিয়াছ, সেইরূপ পরিচয়ই তুমি দিলে! কিন্তু যাহাকে তুমি তোমার যন্ত্রপুত্তলি মনে করিয়া দূতীরূপে পাঠাইলে, সেই কি মনে মনে বুঝে নাই যে,

তুমি কি অপদার্থ ও নীচ! প্রবল ইন্দ্রিয়তাড়নায় সোহিনী তাহার অমূল্যনিধি নষ্ট করিয়াছে বটে, কিন্তু এক হিসাবে সে, তোমাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। ঐ দেখ, পতিতা সোহিনী, তোমার প্রতি কিরূপ ঘৃণা ও অবজ্ঞাভরে চাহিয়া চলিয়া গেল এবং তাহার উপস্থিত কর্ত্তব্য সাধিতে, সে কিরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। ছিঃ, পাটোয়ার ছিঃ! কেবলই কূট বুদ্ধি-বৃত্তির অনুশীলন করিয়াছ, হৃদয়ের দিক্ হইতে কাহাকেও দেখিবার চেষ্টা আদৌ কর নাই। তা যদি করিতে, তো সহজেই বুঝিতে, সোহিনী দ্বারা তোমার পাপ অভিসন্ধি সিদ্ধি—কিছুতেই হইবে না, বরং তদ্বিপরীত ফলই ফলিবে!

তা এইরূপেই কর্ম্মফল ফলিয়া থাকে। বিধাতা এইরূপেই মানুষকে যথাকার্য্যে নিয়োজিত করেন। মানুষ তাঁহার হস্তে যন্ত্রপুত্তলি মাত্র।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পিশাচ প্রমথের প্রমোদ-কক্ষ হইতে বিদায় হইয়া সোহিনী আপনার গৃহে আসিল। কিছুক্ষণ উন্মনা হইয়া নিরিবিলি সে কি ভাবিল।

ভাবিল,—"হায়! যথাকার্য্যের যথা পুরস্কার! না বুঝিয়া পিশাচকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম; তাহার ফল হাতে হাতে পাইতেছি। ওঃ! বিষম অন্তর্দাহ! প্রাণ জ্বলিয়া পুড়িয়া ক্ষার হইতেছে। কিন্তু—কিন্তু তবুও তো লালসার হাত হইতে অব্যাহতি পাইতেছি না? যদি এই দণ্ডে মৃত্যু হয়, সকল জ্বালার হাত এড়াই। উঃ! কি ভীষণ নিষ্ঠুরতা! কি কূট কৌশল! ভাই হইয়া

ভাইকে—মার পেটের সহোদরকে—যে এমন বিষম বিপথে ফেলিবার কল্পনাও করিতে পারে, তার অসাধ্য কর্ম্ম কি? পৃথিবীতে কোন্ মহাপাপ, এ পিশাচের দ্বারা সাধিত না হয়? এই স্নেহ-দয়ামায়াহীন চণ্ডালকে আমি ভজনা করিয়াছিলাম? ছি! ছি! লজ্জায়, ঘৃণায়, ক্ষোভে, রোষে আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা হইতেছে।—ভগবান্, কেন আমায় অবলা রমণী করিয়াছিলে? হায়! আমি কাঁদিতেও পারিতেছি না,—সকলই আমার দুষ্কৃতির ফল।—সকলই যেন স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছে। পাপিষ্ঠের সমস্তই ভাণ, সবই দোকানদারী! হাসি পায়,—ও পিশাচের আবার প্রেম, ভালবাসা! কি কুকর্ম্মই করিয়াছি,—কি ঠকাই ঠকিয়াছি!"

হতভাগিনী গৃহকার্য্যে মনোনিবেশ করিতে চেষ্টা পাইল,—পারিল না। মনে বিষম, সাংঘাতিক আঘাত লাগিয়াছে,—বড় ক্ষোভ ও অনুতাপ জাগিয়াছে,—চিত্ত স্থির করিতে পারিতেছে না।

আবার তার মনে তোলাপাড়া হইতে লাগিল,—“হায়! আমরা গরীব বলিয়া নরাধম আমাকে পয়সার লোভ দেখাইল। অম্লানবদনে বলিল, মোহিনীকে আমি মন্মথর সঙ্গে——হা ঈশ্বর! ধনের গর্ব্ব মানুষকে এত অন্ধ করে?”

সোহিনীর চক্ষে এবার জল আসিল। দুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রু তাহার গণ্ডস্থলে গড়াইয়া পড়িল। প্রতিহিংসা মনে জাগিল। কিন্তু ভাবিয়া দেখিল, নিষ্ফল সে পাপ চিন্তা,—দর্পহারী ভগবান্ ভিন্ন তাহার দর্প কেহ চূর্ণ করিতে পারিবে না।

কত কথাই মনে জাগিতে লাগিল,—“পিশাচ বলে কি না—মন্মথকে মদ ধরাও। মদের মত্ততায় তাহাকে পাগল করিয়া——উঃ! কি ভীষণ দুরভিসন্ধি!—উদ্দেশ্য কি না, ভাইকে পথে বসাইয়া তার সর্ব্বস্ব হস্তগত করিবে! এত ধনের লোভ? এমনি একাধিপত্যের ইচ্ছা?—দণ্ডমণ্ডের নিয়ন্তা, তুমিই এর বিচার কোরো!”

চিন্তার গতিটা এবার আর এক দিকে ফিরিল। সহৃদয় মন্মথর প্রতি তার সহানুভূতি আসিল। সহানুভূতি পূর্ব্বাবধিই ছিল,—আজ যেন তাহা পূর্ণমাত্রায় দীপ্যমান্ হইয়া উঠিল। সেই সহৃদয়, পরদুঃখকাতর, স্নেহময় মন্মথর মধুর মনোহর মূর্ত্তি হৃদয়ে জাগরূক হইল। যে দেবোপম রূপ দেখিয়া, ততোধিক স্নেহময় প্রেমপ্রবণ হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া—মোহিনী মায়াবিনী আপনাহারা হইয়াছে,—ধীরে ধীরে সোহিনী পোড়ারমুখীর হৃদয়েও সেই সোনার স্বপ্ন জাগিল।

আবার তাহার চোখে জল আসিল ;—“আ ছিঃ ছিঃ! আমি এ কি ভাবিতেছি ?” হতভাগিনী সোহিনী চোখ দুটি মুছিয়া মনে মনে বলিল, “হায়! দুর্ব্বল রমণীহৃদয়! হারে পরপ্রত্যাশী জীব! ছি, ছি, শত ধিক্ তোরে! একের নিকট ঘৃণিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত হইয়া আবার তুই—আ, ছিঃ ছিঃ! মনে করিতেও আত্মধিক্কারে আপনি মরিয়া যাই,—

মরমে মরমে আঘাত লাগে।—তবু তুমি অশান্ত চঞ্চল মন,—হায়! এত নীচতায়ও তুমি গঠিত হইয়াছিলে? বুঝিলাম, এই জন্যই পিশাচের হস্তে তোমার এই নির্ম্মম অভিনয়!"

অন্তর্দাহে হতভাগিনী ছটফট করিতে লাগিল। দেওয়ালে মাথা ঠুকিল। মাথার চুলও দু'এক গোছা ছিঁড়িয়া ফেলিল। শেষ বিছানায় পড়িয়া, বালিসে মুখ লুকাইয়া, নীরবে কিছুক্ষণ কাঁদিল। একবার ভাবিল, "আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালার অবসান করি"; আর বার ভাবিল, "না, তা এখন থাক্, অগ্রে প্রাণের মন্মথকে পিশাচের কবল হোতে রক্ষা করি,—তাঁকে সতর্ক করিয়া দেই;—তারপর ও চিন্তা।—মরণ? সে তো আপন হাতে,—যখনি ইচ্ছা তাহা পারিব।"

মনের সংগ্রাম সমানে চলিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া মোহিনী নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল। এইবার ভাবিল,—"আবার এদিকে মোহিনীর

দশাই বা কি হইবে? আমার প্রাণের মোহিনী —স্নেহের নিধি—ভালবাসার ধন,—হায়! তাকে যে আমি বড়—বড় ভালবাসি! সেও যে আমার ভালবাসায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে? —তার নিকট অবিশ্বাসিনী হবো?—হাঁ, এও একরূপ বিশ্বাস-ঘাতকতা বৈকি? মনে মনেও তো তার বাঞ্ছিতের উপর লোভ পোড়েছে? আরে লালসাময় অধম জীবন! তোমার মরণই মঙ্গল!"

দুর্ব্বহ হৃদয়ভারে প্রপীড়িতা হতভাগিনী এবার কি মনে করিয়া শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিল। এক খানি গাত্রমার্জ্জনী লইয়া ধীরভাবে গৃহ হইতে বাহির হইল। বরাবর মন্মথদের সেই নির্জ্জন পুষ্পোদ্যানের বাঁধাঘাটে গেল। ধীরে ধীরে সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া জলে নামিল। এক-গলা জলে গিয়া দাঁড়াইল। ধীরে, অতি ধীরে আরো একটু গেল,—জল তাহার চিবুক স্পর্শ করিল। একটু থমকিয়া দাঁড়াইল। ভাবিল, "হাঁ, মরি; মরিয়া

সকল জ্বালা নির্ব্বাণ করি। কিন্তু——”আবার পরক্ষণে মনে ‘কিন্তু’ জাগিল।—“কিন্তু মন্মথ-ধনকে তো একবার জন্মশোধ—শেষদেখা হইল না? মোহিনীর সেই মধুর মুখেও তো একটি চুম্বন করিয়া তাহার নিকট ক্ষমা লইয়া আসা হইল না?”

সহসা কি ভাবিয়া হতভাগিনী একবার পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিল। যেন কে অলক্ষ্যে আকর্ষণ করিয়া তাহার সেই দৃষ্টি ফিরাইল। সঙ্গে সঙ্গে মোহিনী একটু হটিয়াও আসিল,—চিবুকস্পর্শ জল এবার গলার কাছে গিয়া ঠেকিল।

হরি হরি! সেই দৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে হত-ভাগিনী দেখিতে পাইল,—দেবোপম মধুর মূর্ত্তি, সুঠামসুন্দর মন্মথ—সেই উদ্যানস্থ দ্বিতল কক্ষের গবাক্ষপথে মুখ রাখিয়া, আপন অতুল্য রূপের জ্যোতি ছড়াইয়া, কোমলকরুণস্নিগ্ধ চক্ষে, বড় সহৃদয়তার সহিত তাহাকে দেখিতেছেন!

বস্তুতই মন্মথ একটু কৌতূহলী হইয়া দেখিতে-

ছিলেন, স্ত্রীলোকটি কে,—এবং এমন অসময়েই বা কেন—ধীরে ধীরে—প্রায় ঐ ডুব-জলে গিয়া পড়িতেছে। তখন অপরাহ্ণ উত্তীর্ণ প্রায়—সন্ধ্যা হয়-হয়। তাঁহার একটু শঙ্কা হইয়াছিল, পাছে স্ত্রীলোকটির মনে—কিন্তু শেষ বুঝিলেন, না, তা নয়; তাই প্রফুল্ল দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া দেখিলেন, সে সোহিনী,—মোহিনীর বড় বোন্। ধীরে ধীরে তিনি একটি নিশ্বাস ফেলিয়া গবাক্ষ হইতে অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন।

সোহিনী পোড়ারমুখীর আর মরা হইল না। জলে নামিয়া, ডুব-জলের কাছাকাছি গিয়াও সে থমকিয়া দাঁড়াইল। মন্মথর মোহনরূপ সতৃষ্ণনয়নে দেখিয়া, তাহার মরণ-সাধ ঘুচিল। এখন সাধ হইল, এমনি সর্ব্বাঙ্গ জলে ডুবাইয়া, আকণ্ঠ ভরিয়া, সে মন্মথর সে অপরূপ রূপসুধা পান করে। কিন্তু বিধি বাম,---হতভাগিনীর সেই সাধের সঙ্গে সঙ্গে মন্মথ মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

বয়স হইলেও সোহিনী পোড়ারমুখী সুন্দরী বটে। যতই হোক, সে মোহিনীর বোন্,—জাত-সাপ,—সুদৃশ্য গোক্ষুরা;—তখনো তার সেই যৌবনজুয়ারে একেবারে ভাঁটা পড়ে নাই। অতৃপ্ত কামনানল তাহাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে,—জলে সে আগুন নির্ব্বাণ হইল না!

বরং জল হইতে মদনের ফুল-শর—যেন সাক্ষাৎ কন্দর্পের রূপচ্ছটা তাহার গায়ে গিয়া লাগিল,—সে অধীর হইয়া পড়িল।

তখন আর উপায়ান্তর নাই দেখিয়া, সেই এক-গলা জলে দাঁড়াইয়া, হতভাগিনী কাঁদিতে লাগিল। নীরব সে ক্রন্দন; দীঘীর জলের সহিত সেই নয়ন-জল মিশিয়া চলিল।

"হায়! ঐ দেবদুর্ল্লভ রূপ, ঐ স্বর্গীয় সুধা,—আমি বায়সী,—আমার হইবে কেন? আমি পতিতা, কলঙ্কিনী—তাহাও উনি জানেন। তাই আমাকে দেখিয়া উনি মুখ ফিরাইলেন। কিন্তু ঐ

পবিত্র নিষ্কলঙ্ক মুখ, আমার না হইয়া যদি মোহি-
নীরও হইত ? স্নেহময়ী ভগিনীও আমার—যদি এক
দিনের জন্যও ও-মুখের অমৃত-আস্বাদ লইতে
পারিত ? শুনেছি, মোহিনী মনে মনে ঐ দেবমূর্ত্তির
পূজা করে মাত্র ;—এক দিনের জন্যও ও দেব-অঙ্গ
স্পর্শ করে নাই। হাঁ, সত্য,—সম্পূর্ণ সত্য ; সে
আমার কাছে মনের কথা লুকায় না ;—অনেক
পীড়াপীড়িতে স্পষ্টই একদিন বোলেছে,—ওতেই
তার সুখ, মনে মনে পূজা করিয়াই সে মনের সাধ
মিটাইতে চায়।—আর আমি ? আমি কি পাপিনী ?
এক মহাপাপীর ভোগে উৎসৃষ্টা হইয়া আবার
এই সরলা, মুগ্ধা, অনাঘ্রাতা বালিকার বাঞ্ছিত
ধনকে মনে মনে অপহরণ করিতেছি ?—হাঁ, মরণই
আমার মঙ্গল,—তবে ডুবিনা কেন ?"—জলে দাঁড়া-
ইয়া হতভাগিনী এইরূপ আকাশ পাতাল ভাবিতেছে,
এমন সময় মোহিনী একটু ব্যাকুলচিত্তে সেখানে
আসিল এবং ঈষৎ ভয়কম্পিত স্বরে ডাকিল,—

"দিদি, দিদি, তুমি এখানে? এমন অসময়ে কেন দিদী তুমি এই কালাদীঘীর অতলজলে গলা জুড়িয়া দাঁড়াইয়া আছ? তোমার মনোভাব কি, আমায় বলিবে না? আমি যে তোমায় খুঁজিয়া খুঁজিয়া সারা হইয়াছি?"

সোহিনী মোহিনীর কণ্ঠস্বর শুনিল, বুঝিল, সে ভীত হইয়াছে; তথাপি সে কোন উত্তর দিল না,—এমন কি, একবার ফিরিয়াও চাহিল না।

মোহিনীর সন্দেহ আরো বাড়িল। অধিক উৎকণ্ঠার সহিত গম্ভীরস্বরে আবার বলিল, "উঠ, উপরে এস,—একাকিনী ঐ জলে দাঁড়াইয়া, ও কি ভাবিতেছ?"

এবার সোহিনী একটি নিশ্বাস ফেলিয়া পশ্চাতে চাহিল, মোহিনী দেখিল,—তাহার দিদীর চক্ষে জল।

মমতার মধুরস্বরে মোহিনী পুনরায় বলিল, "একি দিদি, তুমি কাঁদিতেছিলে? কেন কাঁদিতে-ছিলে, আমায় বলিবে না দিদি?"

"না, ও কিছু নয়,—চোখে আমার কি পড়িয়াছিল,—চোখটা বড় কর্‌কর করিতেছিল, তাই এই জলে দাঁড়াইয়া চোখে জলের ঝাপ্‌টা মারিতেছিলাম।"

"না দিদি, আমায় ভাঁড়াইলে!"

ঈষৎ কৃত্রিম হাসি হাসিয়া, জল হইতে উঠিতে উঠিতে সোহিনী বলিল, "ভাঁড়াইব কেন বোন্? তোমায় কি আমি পর ভাবি যে, মনের কথা গোপন করিব?"

"আমি তো তাই জানি। কিন্তু আজ যেন মনে হইতেছে, তুমি কি উৎকট মনঃপীড়া আমায় গোপন করিলে।"

"এঁ্যা, গোপন? না, ঠিক তা নয়, তবে—"

"তবে কি বলিতেছিলে বলো,—আমি তোমার ছোট বোন, মা ছিল না,—মেয়ের মত তুমিই আমায় মানুষ কোরে এসেছ,—তোমার মনোতুঃখ কি, বলনা দিদি আমার?"

সহানুভূতির অমৃতশীতলকণ্ঠে সোহিনী গলিয়া গেল, ভাবিল, "মরিতে তো বসিয়াছি, আর লজ্জা করি কেন? বিশেষ মন্মথকে একটু সতর্ক করিয়া দিয়া যাইতে হইবে।"

প্রকাশ্যে কহিল, "বলিব;—তোমায় মনের কথা জানাইব না বোন্?"—সোহিনী স্নেহভরে মোহিনীর চিবুক স্পর্শ করিয়া, সেই হাত আপন ওষ্ঠে রাখিয়া, একটি মধুর চুম্বনধ্বনি করিল। লজ্জায়, গৌরবে, মাতৃস্থানীয়া অগ্রজার স্নেহ-করস্পর্শে—মোহিনীর সেই অপূর্ব্ব দীপ্তিপূর্ণ মুখ-খানি ঈষৎ রক্তিমাভা ধারণ করিল,—আকর্ণবিস্তৃত কৃষ্ণতারবিশিষ্ট প্রফুল্ল চোখ দুটি যেন হাসিতে লাগিল।

অদূরে—সেই দ্বিতল গবাক্ষ-পথ হইতে, ঠিক্ সেই সময় মন্মথও একবার সেই দিকে চাহিলেন। চারি চক্ষের মিলন হইল, কিন্তু তাহা নিমেষ মাত্র। কেন না, আজ সোহিনীও সেখানে দাঁড়াইয়া আর্দ্রবস্ত্র

ত্যাগ করিতেছে। তাহার সহিতও তাঁহার আর একবার চোখোচোখি হইল। মন্মথ দেখিলেন, সোহিনীর চোখ দুটি বড় দীনতাব্যঞ্জক,—যেন কতকটা অপরাধীর ভাব। ভাবিলেন, "আত্ম-অপরাধ এমনই জিনিস,—সদাই সকলের কাছে সশঙ্কিত থাকিতে হয়।" অগ্রজঘটিত সোহিনীর পতনের কথা তিনি জানিতেন।

সোহিনী যে আর্দ্রবস্ত্র ত্যাগ করিতেছে,—প্রশ্ন উঠিতে পারে, শুষ্কবস্ত্র সে পাইল কোথায়?—শুষ্কবস্ত্র মোহিনীই সঙ্গে আনিয়াছিল। সেও গা ধুইবে বলিয়া কাপড় সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল। প্রতিদিন যে পুষ্করিণীতে তারা গা ধোয়, সেই পুষ্করিণীতে তার দিদীকে না দেখিয়া এবং আরো দু'একটা কারণে কিছু শঙ্কিতা হইয়া, সে তন্মুহূর্ত্তে বাবুদের এই কালাদীঘীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। এখানেও তারা এক একদিন গাত্রধৌতাদি কার্য্য করিত। যাই হোক, আজ আর মোহিনী, সে সব কিছু করিল

না, —তার দিদীর রকম সকম দেখিয়া সে তার দিদী-
কেই তাহার শুষ্কবস্ত্রখানি পরিতে দিল এবং তার পর
দিদীর মনের কথা শুনিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ
প্রকাশ করিল। মোহিনীও "বলি বোন্" বলিয়া, পিশাচ
প্রমথঘটিত কাহিনী আদ্যন্ত বলিয়া গেল। কেবল
মন্মথর প্রতি তারও যে মন পড়িয়াছে, সেটুকু
বলিল না। ঠিক বলিলনা নয়,—স্পষ্ট করিয়া বলিতে
পারিল না। বলিতে অত্যন্ত লজ্জা বোধ করিল,
দু'একবার ঢোক গিলিল, বড় বাধ-বাধ ঠেকিতে
লাগিল। বিশেষ সেই জন্যই যে সে মরিতে গিয়া-
ছিল,—একরূপ মোহিনী আসিয়াই তাহাকে
বাঁচাইল,—সেই মরণের পথেও যে সে মন্মথর মধুর-
মূর্ত্তি দেখিয়া আবার বাঁচিতে সাধ করিয়াছিল,—মার
পেটের বড় বোন্ হইয়া—ছোট বোনের নিকট তাহা
সে কোনমতে প্রকাশ করিতে পারিল না। বিশেষ
মেয়ের বয়সী—এবং মেয়ের মতই স্নেহবতী মোহি-
নীর যে সে প্রণয়-প্রতিদ্বন্দ্বিনী—ইহা মনে করিয়া

লজ্জায় তার মাথা হেঁট হইল। প্রখর বুদ্ধিমতী মোহিনী—তার দিদীর এই সব মনের ভাব অতি সহজেই বুঝিয়া ফেলিল। কিন্তু তজ্জন্য তাহার প্রতি বিন্দুমাত্রও রুষ্ট বা ক্ষুব্ধ হইল না। ভাবিল,—"দোষ দিদীর নয়,—তার অদৃষ্টের।—কেন অদৃষ্ট-স্বামী তার মনের বাঁধন অত আল্‌গা করিয়া দিয়াছেন?"

"কিন্তু তুমি মন্মথ পরাণবঁধু,—তুমি তোমার ঐ অপরূপ রূপরশ্মি দেখাইয়া আর কত মোহিনী-সোহিনী-পতঙ্গকে পোড়াইয়া মারিবে?"—মনে মনে এই কথা বলিতে বলিতে মোহিনী জোরে একটি নিশ্বাস ফেলিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

"সে আর বেশী কথা কি?—দাদা আমার বিষয়-সম্পত্তি লইয়া সুখী হইবেন?—সে তো আমার সৌভাগ্যের কথা।—তোমার আর কি কথা আছে বলো।"

"আপনার কাছে সে সব কথা বলিতে কুণ্ঠিত হই। অতি লজ্জাকর কুৎসিত কাহিনী,—কোন্ মুখে তাহা আপনার নিকট প্রকাশ করি?"

মন্মথ বলিলেন, "লজ্জাকর কথা? কুৎসিত কাহিনী?"

উত্তরে সোহিনী কহিল, "শুনিলে আপনারও মাথা হেঁট হইবে,—মনুষ্যজীবনে ধিক্কার জন্মিবে।

হায়! ভাই হইয়া ভাইকে যে এমন ঘৃণিত উপায়ে মজাইবার চেষ্টা করিতে পারে, তাহার মুখদর্শনেও পাপ হয়।”

সোহিনীর মুখে পাপপুণ্যের ধারণার কথা শুনিয়া মন্মথ মনে মনে একটু হাসিলেন। কেন না সোহিনীঘটিত অগ্রজের সমস্ত ব্যবহার তিনি অবগত ছিলেন। তথাপি অপ্রিয় রূঢ়কথায় তিনি তাহার মনঃক্ষুণ্ণ করিলেন না। ধীরভাবে কহিলেন,

“দেখ, তিনি যতই খারাপ লোক হোন,—লোকের সহিত যতই মন্দ ব্যবহার তিনি করুন, তথাপি তিনি আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর;—তাঁহার কোনরূপ নিন্দা আমার কাছে করিতে নাই। তোমার যদি আর কোন বক্তব্য থাকে, তো বলো,—আমার সাধ্যে থাকিলে নিশ্চয়ই তাহা করিব।”

উত্তর শুনিয়া সোহিনী মোহিত হইল। ভাবিল, “এত গুণে গুণবান্ না হইলে,—হে প্রিয়দর্শন! তোমায় দেখিয়া মোহিনী পাগল হইবে কেন?

আর আমিও বা এই বয়সে মহাপাপিষ্ঠা হইয়া তোমার পশ্চাতে ঘুরিব কেন ?”

মোহিনী নিরুত্তর ; মন্মথ দেখিলেন, তাঁহার মনোমোহিনী নায়িকার ভগিনী,—আর কি বলিতে আসিয়া বলিতে পারিতেছে না,—আসল কথা যেন তার চাপা পড়িতেছে।

সহৃদয়তার সহিত পুনরায় তিনি বলিলেন, “দেখ, নানা কারণে আমি বড় উন্মনা আছি, হয়ত তোমার সহিত যেমন ভাবে কথা কওয়া উচিত ছিল, তাহা পারিতেছি না। কিন্তু ইহা স্থিরবিশ্বাস করিও, আমাদ্বারা যদি তোমাদের কোন উপকার হয়, তো তাহা আমি সৌভাগ্য বলিয়া মানিব। বলো,—আমি তোমাদের কিছু করিতে পারি কি না ?”

এইবার মোহিনীর কথা কহিবার একটু সুবিধা হইল। সহৃদয় যুবকের উদার ব্যবহারে প্রাণের ব্যথা প্রকাশ করিবার একটু সুযোগ ঘটিল। একটি নিশ্বাস ফেলিয়া হতভাগিনী বলিল,

"উপকার ? আমাদের আর কি উপকার করিবেন বলুন ? এক—পোড়া পেট ; তা সুখে দুঃখে এক রকমে তাহা কাটিয়া যাইতেছে ;—সে জন্য কারো প্রত্যাশী হইতে হয় না। তবে গরীব বলিয়া সকলেই আমাদের ধনের লোভ দেখায়,—এ ক্ষোভ মরিলেও আমাদের যাইবে না !"

মন্মথ—অতি অমায়িক প্রকৃতিক অহমিকা-শূন্য যুবা—যেন একটু থতমত খাইয়া অপ্রতিভভাবে কহিলেন, "না ভগিনি, আমি কোনরূপ মনঃপীড়া দিব বলিয়া তোমায় এমন কথা বলি নাই। ঈশ্বর জানেন, তেমন স্বভাব আমার নয়। বিশেষ ধনের গরিমা বা কোনরূপ বড়মানুষী দেখানো—অতি-বড় অধমাত্মার কাজ।—কোন্ অর্ব্বাচীন তোমাদের অর্থের লোভ দেখাইয়াছে ?"

"আপনার মহৎ হৃদয়ে এ কলঙ্ক ?—কোন পিশাচেও ইহা দিতে পারে না। তবে বলি,—আপনি দেবতা,—আমার অপরাধ লইবেন না,—আপনার

অগ্রজ আমায় সেই লোভ দেখাইয়া বলেন কিনা—”

বলিতে বলিতে সোহিনীর মুখে কথাটা আট্‌কাইয়া গেল। ব্যথিতভাবে মন্মথ কহিলেন, “কি বলিতেছিলে নিঃসঙ্কোচে বলো ;—দাদা কি বলেন ?”

“হায় ! আমরা গরীব বলিয়া—বড়মানুষ তিনি—তাই ধনের লোভ দেখাইতে সাহসী হইলেন। এমন কি, আমার ভগিনীকে—প্রাণের মোহিনীকে রাজরাণী হইবার উপায় দেখাইয়া দিলেন। সেই কথা বলিবার জন্যই আমার—আপনার নিকট আসা।”

এবার মন্মথর দৃষ্টি ভূমিপানে ন্যস্ত হইল, মস্তক আপনা হইতে অবনত হইয়া আসিল। একটি নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরভাবে মনে মনে তিনি কহিলেন, “হায় ঈশ্বর! চরিত্রে দাগ্‌ পড়িলে এমনি নিষ্ঠুর কথাও মানুষ মানুষকে শুনায় ?”

প্রকাশ্যে সেইভাবেই বলিলেন, "কি বলিতেছিলে, সবিশেষ বলো।"

"সবিশেষ আর কি বলিব? আপনি আমার কথা বিশ্বাস করিবেন কি?"—সোহিনী কিছু নিরাশাব্যঞ্জক অভিমানভরে এ কথা বলিল।

মন্মথ। কেন ভগিনি, আমায় এমনভাবে কথা বলিতেছ? আমি তো কাহাকেও অবিশ্বাস করি না?—দাদা কি বলেন?

লজ্জার মাথা খাইয়া সোহিনী এবার বলিল, "বলেন কিনা, আমি দূতীগিরি করিয়া মোহিনীকে আপনার——"

মন্মথর অবনত মস্তক আরো অবনত হইল। সোহিনী সেই অবসরে বলিল, "সেই সঙ্গে কৌশলে আপনাকে মদও ধরাই, এই তাঁর অভিপ্রায়। মদের মত্ততায় নিশ্চয়ই আপনি হিতাহিত জ্ঞান হারাইবেন, আর সেই অবসরে তিনিও তাঁর মনের মতলব পূরাইবেন,—কৌশলে আপনার

সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি হস্তগত করিয়া আপনাকে পথে বসাইবেন!—ঘোর পাটোয়ার—অর্থগৃধ্নুর একাধিপত্য করিবার বড়ই সাধ!—তাই আপনাকে সতর্ক করিতে আসিয়াছি মাত্র,—অন্য কোন প্রত্যাশা নাই।”

“তবে—” পোড়ারমুখী সোহিনী মনে মনে এই কথা বলিয়া একবার লোলুপ দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিল,—লুব্ধ বিড়াল যেমন একাগ্রদৃষ্টিতে খাদ্যদ্রব্যের প্রতি চায়, সেইভাবে চাহিয়া দেখিয়া—মনে মনে একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “তবে প্রেমময়, পুরুষরতন!—যদি একবার ও-প্রেমমুখ এ হৃদয়ে——”

চমকিত মন্মথ—চমকিতভাবে সোহিনীর সে দৃষ্টি লক্ষ্য করিলেন। দেখিয়াই, ঠিক্ বুঝিতে পারিলেন,—তাহার মনের ভাব কি? কে যেন তাঁর মনের উপর বসিয়া, পাপিষ্ঠার সে দৃষ্টির অর্থ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল।

চমকিত যুবা একটু ভীত হইল। সত্য সত্যই একটু ভীত হইয়া বলিল, "আজ তবে এই পর্য্যন্ত থাক্। যতটুকু শুনিলাম,তাহাতে সমস্তই বুঝিয়াছি।—"ওঃ! জগদীশ্বর!"

প্রকাশ্যে বলিলেন, "এখন তবে তুমি আসিতে পারো। একটি অনুরোধ, তোমার সহিত এ জীবনে যেন আর আমার সাক্ষাৎ না হয়।"

মোহিনী চলিয়া গেল। কামনায় জর জর হইয়া, নিষ্ফল আশা বুকে লইয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় আর একবার তার শেষঅস্ত্র—তার সেই তীব্র কটাক্ষবাণ ও লালসাবিহ্বল আরক্তিম মুখভঙ্গি প্রকাশ পাইল। হায়! লোভে,মোহে,দুরাকাঙ্ক্ষায় হতভাগিনীর প্রাণ পুড়িয়া যাইতেছে,—মুখে কোন কথা প্রকাশ করিতে সাহস পাইল না।

চমকিত মন্মথ আবার চমকিত হইয়া মনে মনে বলিলেন, "ওঃ! কি কঠোর পরীক্ষা! কি বিষম জীবনসমস্যা!—হায় অর্থ! সত্যই তুমি বিষ!—

গুরুকৃপায় এ বিষ ত্যাগ করিতে পারিব। কিন্তু তুমি রমণী,—হায়! কি উপাদানে তুমি গঠিত, কিছুই বুঝিলাম না!"

হা-হা-হা করিয়া হাসিয়া, সহসা সেই পাগলরূপী পুরুষোত্তম কোথা হইতে আসিয়া কহিলেন, "ওরে, ও মায়ার খেলায়,—তুই তো তুই,—দেবতায়ও অসামাল হন!—বিষ্ণুর মোহিনী মূর্ত্তি-ধারণের সে কথা মনে আছে তো?—বাপ্‌!"

"বাবা, বাবা, এ সময়ও আপনি?—সত্যই আপনি অন্তর্য্যামী?"

"কি তোর বোধ হয়?"

"বোধ যাহা হইবার হইয়াছে,—আশীর্ব্বাদ করিবেন, আর যেন এ বোধের অন্যথা না হয়।—হায় রমণীর রূপ!"

"কেন রে,—রূপে ধিক্কার জন্মালো কেন রে? অমন প্রাণোন্মাদকারিণী চিন্তা,—যাতে আপনাকে ভুলেছিস, ভগবান্‌কে ভুলেছিস,—সংসারের সমস্তই

কর্ম্মনাশার জলে ফেলে দিয়েছিস,—তাতে তিতিক্ষা হোলো কেন রে ?”

“আর বাবা !”—অতি বিষাদভরে, কাঁদ-কাঁদ-মুখে যুবক এই কথা বলিয়া পাগলের পানে চাহিয়া রহিলেন।

পাগল বলিল, “কেন, মন্দ কিরে ? এক মোহিনী ছিল, তুই মোহিনী হোলো,—নাম-ফিরি বৈত নয় ?—মোহিনী না হোয়ে সোহিনী ! এমনি রোহিণী, রঙ্গিণী, হরিণী—কত লাল নীল পরী আস্‌বে যাবে !—মন্দ কিরে ? জন্ম জন্ম যা চেয়ে এয়েছিস, পাবিনি ?—কাঁদ্‌ছিস কেন ? নে, সাধ মিটিয়ে নে !”

“বাবা, বাবা, এখনো তোমার ছলনা ? তবে এই আমি তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মোর্‌বো !”

“হাঁ, মরণটা অমনি মুখের কথা কিনা ?—যা, ঘরের ছেলে ঘরে যা, ; দুধ ভাত খেয়ে ঘুমুলেই—

ও ভাব অম্‌নি উপে যাবে অখন।—বিষয়-আশয় গুলো কি কোর্‌বি?”

“গরীব দুঃখীদের বিলিয়ে দেবো, দেশদেশান্তরে অন্নছত্র খুলে দেবো, বাকী দাদার নামে সব লিখে দেবো,—ও বিষ আর ছোঁবো না!—হায়! মার পেটের ভাইও ওতে শত্রু হয়।”

“এ কথা আজ জান্‌লি? আরো অনেক আগে, এ তোর জানা উচিত ছিল।—আর ঐ মাণিক-জোড়—মোহিনী-সোহিনী?”

“এই আপনার চরণে শপথ কোরে বোল্‌ছি,—ওরা আমার মা—নারীজাতি মাত্রেই আজ হোতে আমার জননী!”

“বেশ, বেশ, ভালো কথা,—খুসী হোলুম। কিন্তু বাপু, এই মাতৃমূর্ত্তি দিয়েই তোমার পরীক্ষা হবে,—আরো একটু কর্ম্মভোগ আছে। এখন তবে আমি আসি,—কি বলো?”

“সে দুর্দ্দিনে দেখা দিয়ো দয়াময়, এই ভিক্ষা!”

"বাক্‌দত্ত হোতে পাল্লুম না বাপু,—কি জানি পাগলের খেয়াল! তবে গুণধর ভাইটিকে সব বোলে-কোয়ে খালাস হও। হাঁ, মনের ভেতোর কিছু পুষে রাখা ভালো নয়।—আহা! কৃষ্ণের জীব, ওরও পিপাসা মিটুক।"

"যে আজ্ঞা।"

"কিন্তু দেখো বাপু, আমার ঐ মা দুটিকে কিছু বোলো না;—ওঁরা যেমন জাল পেতে চোলেছেন, অমনি জাল পেতেই চলুন। ঐ জাল দিয়েই ওঁদের পরীক্ষা হবে।"

"আপনার আদেশ শিরোধার্য্য।"

"আমি তো মস্ত মন্দ,তার আবার আদেশ! তবে পাগলকে যখন বিশ্বাস কোরেছ, তখন শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বাস কোরো,এই অনুরোধ।—কি ভাব্‌চ? যদি এ-কূল ও-কূল দুকূল যায়?—তা গেলই বা? এম্‌নেই বা কোন্ কূল রেখেছ? কুলের মাথা তো অনেকদিন খেয়েছ বাপু?—যাও যাও, তোমার

দাদা আস্‌ছে, দাদার সঙ্গে বোঝা-পড়া কোরে নেও,—আমি চোল্লুম।”

নিমেষে পাগল কোথায় উধাও হইয়া গেল। মন্মথ বিস্মিত, চমকিত, একটু ভীত হইয়া—তথায় বসিয়া পড়িলেন। প্রমথ সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

দুই ভায়ে কিছুক্ষণ কথা হইল। এ-কথা সে-কথা, বিষয় আশয়ের কথা,—প্রমথ একে একে অনেক কথা পাড়িলেন, মন্মথ মন দিয়া সমস্ত শুনিলেন। সন্দিগ্ধচেতা প্রমথ শেষ বলিল, "মোহিনী কি কোন অপ্রিয় কথা তোমায় বলিয়া গিয়াছে? যদি তাই হয়, জানিয়ো, সে সেই দুষ্টার রচনা,—আমি তোমায় প্রাণের ভাই বলিয়াই জানি।"

মন্মথ আর মনের ভিতর কোন কথা গোপন রাখিতে ইচ্ছা না করিয়া সরলভাবেই সমস্ত বলিলেন। শেষ বলিলেন, "দাদা, অর্থে আমার

আর স্পৃহা নাই। জমিদারী, ভূসম্পত্তি, নগদ টাকা, কোম্পানীর কাগজ—আজ হইতে সমস্তই আপনার। কেবল দীন দুঃখী ও অনাথ আতুরকে আপনি কিছু দিবেন, এইমাত্র আমার ভিক্ষা। আমি অদ্যই আপনাকে আমার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি রেজেষ্ট্রী করিয়া দিতেছি।”

“কেন ভাই, কেন?—তোমার এই নবীন বয়স, নবীন উদ্যম, শত সাধ, শত আশা—এ সকলে জলাঞ্জলি দিতে চাও কেন ভাই?”—পাটোয়ার পুরুষরত্ন এইরূপ অনেক মন-মজানো কথা বলিয়া ভাইকে আপনার ভালবাসা জানাইতে লাগিলেন।

মন্মথ সংক্ষেপে তাঁহাকে বুঝাইলেন,—“আমি অবিবাহিত, অর্থে আমার প্রয়োজন নাই;—আপনি ইহার সদ্ব্যবহার করিবেন।”

“তুমিও তো বিবাহ করিতে পারো,—এখনো তো বয়স যায় নাই।”

“ও অনুরোধ আমায় করিবেন না, এই ভিক্ষা।”

"মোহিনী——"

"তিনি আমার মা,—আপনিও তাঁহাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখিবেন, এই প্রার্থনা।"

"সে কি! তুমি পাগল হইলে নাকি? পাপিষ্ঠা মোহিনী তোমার হৃদয়ে বিষ ঢালিয়া তোমায় পাগল করিল নাকি?"

"পাগল কেউ কাউকে করে না,—আপন অদৃষ্ট ও কর্ম্মফলে মানুষ পাগল হয়। আপনি অগ্রজের ন্যায় ব্যবহার করুন,—আর সে কুৎসিত-কাহিনী তুলিয়া পরস্পর লজ্জিত হইবার, কোন প্রয়োজন নাই।—ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া বলিতেছি,—আজ হইতে আমাদের পৈত্রিক যাবতীয় ভূসম্পত্তির মালিক—আপনি একক,—কপর্দ্দকমাত্র অধিকার আমার উহাতে নাই।"

"তা—তা—"

"কিন্তু হজম কোত্তে পার্‌বে তো পাটোয়ার মশাই?—কি বলো?"—সহসা সেই পাগল কোথা

হইতে আসিয়া প্রমথর মুখের উপর এই কথা বলিল।

"আরে মোলো,—পাগ্‌লাটা এসময় কোত্থেকে মোত্তে এলো ?—দেউড়ীতে কি কেউ নেই ?—দরোয়ান, দরোয়ান !"

"যো হুকুম মহারাজ !"—বলিতে-না-বলিতে পাগল বলিল, "তা বাপু, আমি আপনি ভাগ্‌চি ;—বোল্‌ছিলুম কি, একটু শান্তশিষ্ট হোয়ে থেকো, কারুর উপর দাদ্ তুল্‌তে যেয়ো না ;—তাতে শ্রেয়ঃ নেই।—ষোলআনা বিষয়ের মালিকানা স্বত্ব যেমন কোরে হোক্ তো হোলো !"

"তুমি এ জান্‌লে কি রকম কোরে ? তুমি এ,—মন্মথ ! এ হতচ্ছাড়াটাকে তুমি কোত্থেকেজোটালে ? কি বুঝি বুজ্‌রুকি নিয়ে আনাগোনা কোচ্চে ?"

"বুজ্‌রুকি নয় গো বাবু মশাই, তোমার দলি-লের সাক্ষী হোতে এয়েছি।"

"মর্ বেটা ! আবার দলিল কি ?—দূর হ।"

"সর্ব্বদর্শী—সর্ব্বান্তর্য্যামীকে অমন কথা বোল্‌বেন না দাদা,—সত্যই আমার বাক্যের সাক্ষিস্বরূপে ইনি আপনার সাম্‌নে এয়েছেন।—আমি ডেকেছি, তাই এয়েছেন। মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম—পাগলবেশে এয়েছেন। আমি পুনরায় এই পরম পুরুষের সাম্‌নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোচ্চি—"

"পরমপুরুষ আবার কেহে ছোক্‌রা? বাঃ, বাঃ!—বেশতো তুমি?—রামা পাগ্‌লা বলো?"

দেখিয়া শুনিয়া পাটোয়ার প্রমথ বুঝিল,—"নিশ্চয়ই মন্মথর মাথা খারাপ হোয়ে গেছে; তাই এ পাগ্‌লাটাকে গুরুজ্ঞান কোরে আমাকে সব সোঁপে দিয়ে যাচ্চে।—তা বেশতো, আপনা হোতে দেচ্চে—মন্দ কি? কিন্তু একটু যেন কেমন চক্ষু-লজ্জা কোচ্চে।—সোহিনী হারামজাদী দেখ্‌চি কথাটা বোলে দিয়ে ভায়ার প্রাণে মস্ত একটা চোট্‌ দিয়েছে।—হুঁ, মোহিনীকে একেবারে মা বোলে ফেল্লে!—আচ্ছা বেটী, থাকো তুমি, তোমায় দেখে

নেবো একবার।—কার্য্যোদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে তোমার ভবলীলা সাঙ্গ হবে জেনো।”

“হু, তা হবে না গো বাবু মশাই,—আপনার অস্ত্রে তুমি আপনিই কাবু হবে!—বড় ক্ষিদে পেয়েছে, কিছু খেতে দাও না বাবু?”

“যা, এখেনে দীক্ কোরিসনে, আমাদের একটা কাজের কথা হোচ্চে।—কে আছিস রে, এ পাগ্‌লা বেটাকে মেরে তাড়িয়ে দেতো রে!”

“দাদা, কাজের কথা তো হোয়ে গেছে? কিছু পরেই আমি ফিরে আস্‌ছি, আপনি এখানে একটু অপেক্ষা করুন।”

“তা—তা, তোমার বিষয় আমি নেবো? তোমার বিষয়—”

উচ্চ হাসি হাসিতে হাসিতে পাগল বলিল,

“পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ, এতো বড় মজা।
খোদার মর্জ্জি—তাইতো ধন,
রাখ্‌লে কুলের ধ্বজা॥”

পাগ্‌লা আরো কি বলিতে যাইতেছিল,—পাটোয়ার পুরুষ তাহাকে এক ধমক দিলেন ;—অগত্যা পাগল এক উচ্চ তীব্র অট্ট হাস্যধ্বনি করিয়া উঠিল। সে ধ্বনিতে পাটোয়ার শিহরিলেন, যেন তাঁহার হৃদয়ের অস্থিপঞ্জর একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল। ভাবিলেন, "কে এ পাগল ? পাগলের হাসিতে আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল কেন ? তবে কি তাই ? আচ্ছা দেখি,—কে জয়ী হয় ?"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সোহিনী ও মোহিনীতে সকল কথা খোলাখুলিই হইল। মোহিনী বলিল, "যদি মজিলে, মজিয়া বাঞ্ছিতকে না পাইলে, তবে মরিলেনা কেন? এ দুর্ব্বহ দেহভার কিরূপে বহন করিবে?"

"মরিতে তো গিয়াছিলাম দিদী? সেই কালা-দীঘীর জলে——হায়! তুমিই তো আমায় পশ্চাৎ হইতে ডাকিয়া আমার মরণের পথে বাদী হইলে বোন্!"

"এখন উপায়?"

"মোহিনি, মার পেটের বোন্ বটে তুই, কিন্তু তোকে মেয়ের মত মানুষ কোরেছি;—ক্ষুধা তৃষ্ণা

নিদ্রা ত্যাগ কোরে তোকে লালন পালন কোরে এসেছি ;—আজ তোর কাছে এই ভিক্ষা,—পাষাণ প্রাণে নির্লজ্জা হোয়ে বোল্‌চি,—মন্মথকে আমায় ভিক্ষা দে ! আমার প্রাণ যায়, তুই রক্ষা কর্ !"

মোহিনী সংক্ষেপে তাহাকে বুঝাইল,—মন্মথর আশা সে একরূপ ত্যাগ করিয়াছে ; দৈহিক মিলন তাহাদের হয় নাই, এজন্মে হইবেও না,—সে চিন্তাও উপস্থিত তাহার নাই। কিন্তু সোহিনী—তার হতভাগিনী অসংযতা দিদী—এ কি সর্ব্বনাশী কামনা করিতেছে ? যাহা একরূপ অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, সেরূপ চিন্তায় সে পাগল হইতে যায় কেন ?

উত্তরে পোড়ারমুখী সোহিনী তাহাকে বলিল, "পতঙ্গ যে আগুনে ঝাঁপ দিয়া মরে, সে কি সাধ করিয়া ? প্রাকৃতিক আকর্ষণ,—হায় ! আমি কি করিব ? মোহিনি, ভগিনী আমার ! আমার তুলনায়,—তুমি দেবী ;—কেননা, তুমি তোমার

মনকে আপন বশে রাখিতে পারিয়াছ। আর আমি পাপিষ্ঠা, কুটার ন্যায় কামনাস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছি! তুলনায় তোমায় আমায় স্বর্গ-মর্ত্ত্য ব্যবধান!"

"সে যাই হোক্, কিন্তু নিষ্ফল আশা বুকে নিয়ে তুমি নিরর্থক দগ্ধ হোচ্চ।"

"হাঁ মোহিনি, হাঁ, পুড়্‌চি,—দিনরাত পুড়্‌ছি,—কুলকাঠের আগুনের মত পুড়্‌চি,—বুক ক্ষার হোয়ে গেছে,—আমায় রক্ষা করো। উঃ! বড় তৃষ্ণা, আমার প্রাণ যায়,—আমায় রক্ষা করো।"

"এস, তবে দু'জনে এক সঙ্গে মরি। একটা সংসার মজিয়েছি, একটা মানুষের মত মানুষকে মজিয়েছি,—এস, মোরে তার প্রায়শ্চিত্ত করি।"

"না, তাও পারবো না,—মোত্তে আমি পারবো না,—মরণের জ্বালা সইতে পারবো না,—মন্মথকে চোখে চোখে দেখে বেঁচে থাক্‌তে চাই,—তুমি আমায় ক্ষমা করো বোন্!"

অন্তর্দাহ ও অনুশোচনায় হতভাগিনী ছটফট করিতে লাগিল। তাহার মুখ পাংশুবর্ণ, বুক অঙ্গারমলিন হইয়া উঠিল। হতভাগিনীর এইখানের কর্ম্মভোগ এই খানেই হইতে লাগিল।

এমনি অবস্থায় কিছুদিন অতিবাহিত হইল। হতভাগিনী বুকের জ্বালা জুড়াইতে এক একদিন সেই কালাদীঘীতে অনেকক্ষণ ধরিয়া আকণ্ঠ ডুবাইয়া থাকিত; স্নানের পর স্নান করিয়া মস্তিষ্ক শীতল করিতে যাইত; কিন্তু তাহাতে তাহার আশা মিটিত না। শেষ কলঙ্কিনী একরূপ উন্মাদিনী হইল। উন্মাদিনী মূর্ত্তিতে পথে পথে—অরণ্যে প্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। মন্মথ, যতদূর সাধ্য, তাহার দৃষ্টি হইতে দূরে দূরে রহিলেন। মোহিনী প্রাণপণে জ্যেষ্ঠাকে প্রকৃতিস্থ করিতে চেষ্টা পাইল।

এক দিন সোহিনীর কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না। মোহিনী সর্ব্বত্র তাহার সন্ধান করিয়া বেড়া-

ইতে লাগিল। এইরূপ সন্ধান করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে সে এক নির্জ্জন, দূর প্রান্তরে উপস্থিত হইল।

সেই নির্জ্জন, দূর প্রান্তরে—সৌন্দর্য্যের সীমাবর্ত্তিনী, উদ্দীপ্ত রূপশ্রীসম্পন্না মোহিনী—একাকিনী দাঁড়াইয়া! পথ হারাইয়া, বিপথে পড়িয়া, ভয়াকুলিত নেত্রে—চঞ্চলদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। সন্ধ্যা হয়-হয়। জনমানবের সাড়া-শব্দ নাই। কি করিবে, কি হইবে—কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া সে অত্যন্ত ভীত হইল। দুর্ব্বল হরিণী যেমন ব্যাঘ্রের করালগ্রাসে পড়িবে ভাবিয়া প্রাণ-ভয়ে ভীত হয়, সেইরূপ ভীত হইল। এমন সময় দেবতার শুভদৃষ্টির ন্যায় সহসা মন্মথের মধুর-করুণদৃষ্টি তাহার নেত্রপথে পতিত হইল। প্রাণ পুলকে পূর্ণ হইল, হৃদয় স্নেহরসে ভরিয়া উঠিল। তাহার চক্ষে জল আসিল। সেই জলভরা চক্ষে, আবেশে—আবেগে, ঈষৎ কম্পিত কলেবরে—

কম্পিতকণ্ঠে—সে ডাকিল,—"প্রিয়তম,জীবনসখে! এ সময় তুমি এখানে? আমায় উদ্ধার করিতে কি জগদীশ্বর তোমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন?"

জনশূন্য বিস্তৃত প্রান্তরে, অনন্ত শূন্যে সে স্বর মিলাইয়া গেল। মোহিনী আবার ডাকিল, "মন্মথ, আমার চিরবাঞ্ছিত দেবতা!—একি, মুখ ফিরাইয়া লইলে? কৈ, এখানে তো আর কেহ নাই? এ জনশূন্য স্থানে, এ উন্মুক্ত প্রান্তরে, এস প্রেমময়, একবার প্রাণ খুলিয়া প্রেম-সম্ভাষণ করি? অভাগিনীকে বাঁচাইলে যদি,—তবে——"

"একি, মোহিনি? তুমি এখানে? তুমি একাকিনী এখানে কিরূপে আসিলে মোহিনি?"

মোহিনী সংক্ষপে বুঝাইল, তাহার হতভাগিনী ভগিনীর সন্ধানে আসিয়া, পথ ভুলিয়া, সে এই বিষম বিপথে আসিয়া পড়িয়াছে।

উত্তরে মন্মথ বলিল, "কিন্তু আমায় এরূপ সম্বোধনে অপরাধী করিতেছ কেন মোহিনি?"

উত্তরে পোড়ারমুখী মোহিনী বলিল, "ঠিক্ সম্বোধনই করিয়াছি! এত দিন লোকলজ্জাভয়ে—যাহা বলিতে পারি নাই, আজ এই জনশূন্য নির্জ্জন প্রান্তরে মনের সাধে তাহা বলিতেছি।—তুমিও এই ভাবে আমায় সম্বোধন করো—এই ভিক্ষা। আর কেহ এখানে নাই!"

"আর কেহ নাই? হাঁ, আছেন,—একজন আছেন,—ভগবান্ আছেন। তাঁর সন্ধানে আমি এখানে আসিয়াছি।—কালামুখী, তুমি দূর হও!"

"ভগবান্ যদি আছেন, তিনি তো অন্তর্য্যামী;—তিনি কি তোমার অন্তর দেখিতেছেন না?"

"হাঁ, দেখিতেছেন বৈকি?—তুমি আমার জননী!"

"রাম, রাম!"—কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া, দুই হাত পশ্চাতে আসিয়া মোহিনী উত্তর দিল,—"রাম, রাম! এই সম্বোধন তুমি আমায় করিলে? অন্তরের সহিতই কি করিলে?—তুমি কি পাগল হইলে নাকি?"

"আবার তুমি কথা কহিতেছ? হায়! তোমার লজ্জা নাই, সরম নাই, ধর্ম্ম নাই?—ওঃ! কি ভীষণ মায়ারঙ্গিণী!—অবিদ্যারূপিণী পরমেশ্বরী! মা আমার! সন্তানের নমস্কার গ্রহণ করো!"

হাঃ হাঃ হাঃ রবে উচ্চ হাসি হাসিয়া, সহসা সেই পাগল কোথা হইতে আসিল। সেইরূপ হাসিতে হাসিতে তীব্র শ্লেষকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"লে বেটা, লে—খেয়ে লে, মেখে লে, চেকে লে!"

"একি আপনি? এখানেও আপনি?—গুরুদেব, অন্তর্য্যামি, পতিতপাবন!—ভক্তসন্তানকে ত্রাণ করো দয়াময়!"

"ভয় নেই বাপ, আমি তোর আছি। এতদিন ধোরে দেখ্‌ছিলুম,—সত্যি সত্যি তুই সাধ মিটিয়ে খেয়ে-মেখে-চেকে নিস্ কিনা?—আমার কথার অর্থ বুঝিছিস কিনা? বুঝ্‌লেম, আমার উপদেশবীজ অপাত্রে পড়েনি!—মোহিনি? আর কেন, সোরে পড়,—নইলে পুড়ে ভস্ম হবি! বাবা আমার

তোকে মা বোলেছে; শুধু মুখে নয়,—মনের সঙ্গে মা বোলেছে;—তবে আর মিছে ঘুরে মরা কেন?—ঐ দ্যাখ্ পোড়ারমুখী, তোর সঙ্গিনী আস্‌ছে। তোর মার বয়সী,—ও-ও তোর প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিনী হোয়েছে। বুঝে দ্যাখ্ আবাগী,—এ কাজের কি দাগাবাজী!"

"সত্যই দাগাবাজী!—বাবা, বাবা, আমাদের কি তবে উদ্ধার নেই?"

"দেরী আছে,—আরো দুজন্ম যাবে। মন খুলে মাকে ডাক্, ডাক্ ছেড়ে কাঁদ্, মার মন্দিরে গে—হত্যা দে পোড়ে থাক্!—ও সোহিনি, তুইও যা—তোরও গতি হবে।"

"হবে বাবা—হবে?"

"হবে।"

"আমার গতি হবে?—বাবা, বাবা! আমি যে বড় পতিতা, কলঙ্কিনী? কলঙ্কিনীর গতি কি এত শীঘ্র হয়?"

"হয় রে, হয়!—তুই যে মনে বুঝেছিস—তুই কলঙ্কিনী? যা, তুই বোনে গিয়ে মার মন্দিরে পোড়ে থাক্। তোদের দিয়ে মার একটা কাজ হবে।—মা ব্রহ্মময়ী তারা! সকলকে নিয়ে চল।"

অগ্রে পাগলরূপী পুরুষোত্তম—পথ-প্রদর্শক-রূপে, পশ্চাতে মন্মথ—ভক্ত শিষ্যরূপে, শেষ সেই দুই মায়ারঙ্গিণী—মোহিনী ও সোহিনী—পতিতা অনুতপ্তারূপে—সেই প্রান্তর অতিক্রম করিয়া চলিল।—আর কেহ কোথাও নাই। কাহারো মুখে আর দ্বিতীয় বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না,—যেন যাদুমন্ত্রে সকলেরই অন্তর উলট-পালট হইয়া গেল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পাটোয়ার পুরুষরত্ন প্রমথ—বাঞ্ছিত ধন মনের সাধে পাইয়াছে। একা ষোলআনা ভূ-সম্পত্তির মালিক হইয়াছে, প্রভুত্ব ও একাধিপত্য ষোল আনার উপরও চারিআনা উঠিয়াছে। তাহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে বাঘে বলদে এক ঘাটে জল খাই-তেছে। গুণধর দিনকে রাত—রাতকে দিন করিয়া যাইতেছেন,—তবুও নিবৃত্তি নাই ;—আরো কিসে বিষয় বৃদ্ধি হয়, দপ্‌দপা বাড়ে, লোকে যমের ন্যায় ভয় করে,—এই চিন্তা।

কনিষ্ঠের অর্দ্ধ অংশ দানের কথা—লোকে কানাঘুসি করিতে লাগিল ; শেষ সোহিনীঘটিত কথা

সকলে জানিতে পারিল। তাহাতে পুরুষরত্নের ক্রোধ অতি ভীষণরূপে বৃদ্ধি পাইল,—যেরূপেই হোক, সোহিনী-কণ্টককে ধরাবক্ষ হইতে সরাইতে হইবে!

ভয়ে সোহিনী ঠক্ ঠক্ কাঁপিতে লাগিল। মোহিনী বলিল, "ভয় কি দিদি, মরিতে তো একদিন হইবেই, তবে আর হেথায় সেথায় ঘুরিয়া মরিতে যাইব কেন? অপঘাতে মৃত্যু অদৃষ্টে থাকে,—বাপের ভিটায় বসিয়া হোক।"

পাগলরূপী পুরুষোত্তমের উপদেশক্রমে মোহিনী সম্পূর্ণরূপে আত্মসংযম করিতে পারিয়াছে। মনের মধ্যে যে কিছু কামনার দাগ ছিল, তাহা একটু একটু করিয়া তাহার মুছিয়া যাইতে লাগিল। শেষ সত্য সত্যই তাহার অন্তর ধৌত হইল। তবে জীবনের বদ্ধমূল সংস্কার একজন্মে গেল না। ভগবানের তত দয়াও সে পায় নাই, অন্ততঃ মন্মথর মতো তার কপালজোরও তত নয়।

ভাগ্যবান্ মন্মথ পাগলরূপী সদাশিবের কৃপায় অনেকটা অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন। তবে পরীক্ষার হাত হইতে তিনি একেবারে অব্যাহতি পান নাই। শেষ আর এক দিন এক উৎকট পরীক্ষা হইয়া গেল; এবং সেই পরীক্ষাই তাঁহার অগ্নিপরীক্ষা হইল, সেই কথাটিই এখন বলিব।

যে দেবালয়-চত্বরে মোহিনী প্রায় রাত দিন পড়িয়া থাকে, এক দিন নিশীথে, মন্মথও সেই দেবালয়ে উপস্থিত হইল। সহসা একটা ঘূর্ণী বাতাস উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিও আসিল।

মন্দির-চত্বরের পার্শ্বেই একটি কুটীর ছিল। যাত্রী বা পথিকগণ কখন কখন সেই কুটীরে আশ্রয় লইত। আজ বৃষ্টিতে আশ্রয় লইবার জন্য, স্বয়ং মন্মথ সেই কুটীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। গৃহে দীপ জ্বলিতেছিল। একখানি পুরাতন পালঙ্কে, কে একটি পরমাসুন্দরী যুবতী চুল এলাইয়া, উন্মুক্ত বক্ষে স্মিতমুখে নিদ্রা যাইতেছিল। বোধ হয়

কোন সুখস্বপ্নে সুন্দরীর হৃদয় আলোড়িত হইতে-ছিল, তাই সেই ঘুমন্ত মুখেও সৌন্দর্য্যসুষমা ষোল-কলায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। উজ্জ্বল দীপরশ্মি সে চাঁদমুখে আসিয়া পড়িয়াছে,—অট্টালিকা-কক্ষকে গঞ্জনা দিয়াও—যেন সেই কুটীর আলোকিত হইয়াছে!

মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় মন্মথনাথ সেই কক্ষে প্রবিষ্ট হইলেন। ক্রমে কে যেন একরূপ জোর করিয়া তাঁহাকে সেই পালঙ্কের দিকে লইয়া যাইতে লাগিল। মুগ্ধনেত্রে, বিস্মিতভাবে তিনি সেই সুন্দরীকে একবার দেখিলেন মাত্র। কিন্তু,—হরি হরি হরি! এমন স্থানে,—এরূপ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত অবস্থায়—মোহিনী এই পালঙ্কে শুইয়া?—উঃ!

কিন্তু ভগবান্ প্রসন্ন,—তাই এই মোহিনীমূর্ত্তিতে মন্মথ তাঁহার পরলোকগত স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর প্রতি-কৃতি দেখিলেন।—আশ্চর্য্য! দুই মূর্ত্তি অবিকল এক!—"মা, মা, তুমি এখানে? বিমান হইতে

নামিয়া কি ভয়ার্ত্ত সন্তানকে অভয় দিতে আসিয়াছ ? এখানে এমনভাবে ঘুমাইতে কেন জননি ? —একি ! আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি ? ওঃ ! এ যে মোহিনী ? হায় ! একি সর্ব্বনাশ ! নায়িকার প্রাণোন্মাদিনী মূর্ত্তিতেও মা আমার বিরাজিত ?—তবে জননি, সর্ব্বমূর্ত্তির অধিষ্ঠাত্রী, দেবি ! সন্তানের নমস্কার গ্রহণ করো !"

"একি ! তুমি ? মন্মথ ? আমার জ্ঞানশিক্ষাদাতা প্রেমগুরু ?—তুমি এখানে এমন অবস্থায় নতজানু হইয়া কেন ? দেব, বোলে দাও, কিরূপে আমি পার পাবো,—কোন্ উপায়ে আবার আমার সেই স্বর্গীয় পতিদেবের সহিত মিলিত হইব ! হায় ! সেই প্রেমময় মুখ তো আমার মনে পড়ে না ?— তোমার ইষ্টদেবতা গুরুকে বলো, তিনিই আমায় সে দেবমূর্ত্তি মনে করিয়া দিন !"

হাঃ হাঃ হাঃ রবে সেই কুটীর প্রতিধ্বনিত করিয়া সহসা সেই পাগল কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত

হইল এবং সেইরূপ তীব্র শ্লেষকণ্ঠে মন্মথের উদ্দেশে বলিয়া উঠিল,—"লে বেটা লে—খেয়ে লে, মেখে লে, চেকে লে!—এমন সুবিধেও ছাড়্‌লি!"

"উঃ! কি গভীর শ্লেষপূর্ণ জ্বালাময়ী এ উক্তি! বাবা, বাবা, মোহিনীতে যে আজ আমি আমার গর্ভধারিণী মার মূর্ত্তি দেখেছি?—তবে আর কেন এ দুর্জ্জয় কঠোর পরীক্ষা?"

"সত্যি এ আধারে তোর মার চিন্ময়ীমূর্ত্তি দেখেছিস্? বটে? আঃ! বাঁচ্‌লুম! এদ্দিন ধোরে এই দেখ্‌তেই চাচ্ছিলুম! বাস্, আজ থেকে তোরও ছুটী, আমারো ছুটী! তোর খাওয়া-মাখা-চাকার ভার—মা নিজে নিয়েছেন। একবার হরি হরি বল্।"

"হরি—হরি—হরিবোল্!"

ভক্ত ও ভগবানে মধুর যোগ, মধুর আলিঙ্গন হইল;—মন্ত্রমুগ্ধা মোহিনী মুগ্ধনেত্রে, কৃতাঞ্জলিপুটে নতজানু হইয়া—সে শোভা দেখিল, তাহার অপাঙ্গ

বহিয়া দরদর ধারে জল পড়িতে লাগিল,—সে ধন্য হইল!

তখন বৃষ্টি থামিয়াছে, ধরাবক্ষে জ্যোৎস্নাধারা পতিত হইয়াছে, প্রকৃতি অতি মধুর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

সহসা সেই মধুরতা ভঙ্গ করিয়া, ভীতিবিহ্বল-কণ্ঠে কে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"বাপ সকলেরা কে কোথায় আছ,—আমায় রক্ষা করো,—পিশাচ আমায় গুলি করিতে আসিতেছে!"

সেই নীরব নিথর সুসুপ্ত নিশীথে, সেই পবিত্র নির্জ্জন দেবালয়-প্রাঙ্গণে—সহসা আর্ত্তের এই কাতর কণ্ঠস্বর উত্থিত হইল।

"ভয় নাই" বলিয়া জলদ্‌গম্ভীরস্বরে অভয় দিয়া, বিপদভয়বারণ কাঙ্গালের ঠাকুর—পাগলবেশে চকিতে তথায় আবির্ভূত হইলেন। দেবদেহে দিব্যজ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল,—শ্রীমুখকমল প্রফুল্ল হইল। হাসি-হাসিমুখে নরোত্তম বলিলেন, "কে

তোরে গুলি করে রে! এ দেবতার ঠাঁই,—ভয় নাই,—এখানে নারীহত্যা হইবে না!"

"পতিতপাবন, দয়াময়! আমি পতিতা, আমায় রক্ষা করো! আমি সোহিনী, আমায় বাঁচাও!—পিশাচ প্রমথ আমায় গুলি করিতে আসিতেছে।"

"কে,—প্রমথ? প্রমথ তোমায় গুলি করিবে সোহিনী? কেন,—তোমার অপরাধ?"

"ঠিক অপরাধ কি, জানি না। তবে বোধ হয়, নরদেবতাকে—আপনার মন্মথনাথকে—পিশাচের পাপ সঙ্কল্প জানাইয়াছিলাম,—তাই প্রতিহিংসা-বশে,—অসহায়া রমণী আমি,—আজ সুযোগ পাইয়া, বাড়ী হইতে তাড়িতে তাড়িতে—পিশাচ আমার প্রাণ লইতে আসিতেছে! বাবা, বাবা, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন!—ঐ বন্দুক উঠাইল, ঐ লক্ষ্য করিল, ঐ গুলি ছুড়িল!"

"ভয় নাই, আমার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াও।"

"না বাবা,তা হইবে না !—তোমার অমূল্যজীবন অপেক্ষা কি এ পতিতা কলঙ্কিনীর জীবন অধিক মূল্যবান্ ? না, তা হইবে না !—যা থাকে ভাগ্যে, - এই আমি স্থির হইয়া দাঁড়াইলাম।—বাবা, বাবা, আপনি একটু সরিয়া দাঁড়ান্,—গুলি ঠিক আপনাকে——"

"নারে, না ! তাও কি হয় ? এই গ্ঢাখ্না, কোথাকার ঢেউ কোথায় গিয়ে থামে ?"—হাঃ হাঃ হাঃ রবে পাগল উচ্চ অট্টহাস্য করিয়া উঠিল।

রিভল্ভার বন্দুকধারী—বন্দুক ছুড়িবার জন্য বন্দুকের কল টিপিল ;—হরি হরি হরি ! কৃষ্ণের ইচ্ছায় সে কল ঘুরিয়া গেল,—লক্ষ্য বিপরীতগামী হইল,—গুলি বন্দুকধারীর আপন হৃদ্পিণ্ড ভেদ করিয়া ছুটিল ! রক্তধারা বহিল। প্রেত পঞ্চত্ব পাইল।

"হরি, হরি, হরিবোল ! দয়াময়,—অগতির গতি ! তোমায় নির্ভরে এত সুখ, এত শান্তি ?"—ভক্ত মন্মথর কণ্ঠরোধ হইল।

পতিতপাবন বলিলেন, "কৈ, শান্তি কৈরে বাপ? কৃষ্ণের জীব যে জীবহিংসা কোত্তে গিয়ে প্রাণ হারালে! শান্তি যদি চাস, তবে ভগবানে সর্ব্বস্ব অর্পণ কর্!"

"তুমিই আমার ভগবান্,তোমাকেই সব অর্পণ করিলাম! কিন্তু দেব বলিয়া দিন. শান্তি কোথায়?"

"এই সংসারই তাঁর প্রকৃষ্ট স্থান,—গৃহাশ্রমই তার যোগ্য তপোবন। আয়, আমি তোদের সে তপোবন দেখাই। যাকে তোরা প্রেম বোলিস, সে প্রেম নয়,—কাম। কাম ও প্রেম স্বর্গ মর্ত্ত্য ব্যবধান। কাম—স্বার্থময়, সঙ্কীর্ণ; প্রেম—নিঃস্বার্থ, বিশাল, জগদ্ব্যাপী। প্রেমের উদয় হোলেই শান্তি আসে। প্রেম ও শান্তি—স্বর্গের সুধা। যদি এ সুধা-পানে অমর হোতে চাস,—আয়,আমার সঙ্গে আয়।"

"জয় ভক্তবৎসল ভগবান্—শ্রীরামকৃষ্ণ!"

শান্তি।

শান্তি—সর্ব্বস্ব অর্পণ।

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

গীতা—শ্রীভগবদুক্তি।

শান্তি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সুখী পরিবার। দুঃখের সংসারে সুখী পরিবার। বড় সুখী, বড় সরস হৃদয়, বড় সহানুভূতির আধার।

ধর্ম্মে এ পরিবারের ভিত্তি, চরিত্রের নির্ম্মাল্যে ইহার মধুর পরিণতি, ভগবানে নির্ভর ইহাদের শান্তি।

ঠিক্ যেন পুণ্য তপোবন। দ্বেষ-হিংসা নাই, কলহ-কিচ্‌কিচি নাই, আড়ম্বর ও ঐশ্বর্য্যবিস্তারের চিন্তা অবধি নাই। শান্তি ও সন্তোষ সখ্যসূত্রে সংযুক্ত হইয়া নিয়তই যেন বিধাতার আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিতেছে।

এমনই সুখের সংসারে—শান্ত, শিষ্ট, ঈশ্বর-বিশ্বাসী দম্পতী। অতি সামান্য আয়ে, মনের গুণে, সুশৃঙ্খলার সহিত সংসারধর্ম্ম করিতেছেন। সদাই প্রফুল্লচিত্ত, সদাই সহাস বদন, সদাই কর্ম্মশীল—এটা-সেটা-ওটা কোন-না-কোন কাজে নিয়োজিত। অথচ, নির্দ্দিষ্ট সময়ের অতি অল্পক্ষণ বিশ্রাম মধ্যে, উভয়ে যে সুখ, যে আনন্দ, যে তৃপ্তি উপভোগ করেন, তাহা ধনীর বিপুল ধনাগারের মধ্যে নাই,—সম্পদ ও বিলাসিতার পরিপূর্ণ ভাণ্ডারেও পরিলক্ষিত হয় না।

বড় আরামের অমৃত আলয়। নীরোগ সবল সুস্থদেহ, প্রকৃতিদত্ত সুন্দর স্বাস্থ্য, মলিনতাশূন্য

মনের প্রফুল্লতা, সর্ব্বোপরি সর্ব্বমাঙ্গল্যে গভীর বিশ্বাস—সেই সৌভাগ্যবান্ দম্পতীকে ইহসংসারে নন্দনকাননের শোভা দেখাইতেছে। ফুটন্ত মল্লিকা-ফুলের মত দুটি ফুটফুটে কচি ছেলে মেয়ে সে কাননে সৌন্দর্য্য-সুষমা ছড়াইয়া—দিক্ আলোকিত করিয়া আছে। তাহাদের হাসি-খুসী, খেলা-ধূলা, ভাব-আড়ি,—সরস মধুর আধভাষ—গৃহী পিতা-মাতার বৈকুণ্ঠ-নিলয়। সে নিলয়ে যে দেব-ভাব, যে সাত্ত্বিকতার বিমল ছবি পরিলক্ষিত হয়,—মনে হয়,সে ছবি বুঝি আর দেখিতে পাইব না। বিধাতার বরে, কোন মহাপুরুষের সহাস শুভদৃষ্টিতে, নূতন কালপ্রবাহের প্রবর্ত্তন না হইলে, হয়ত সে পুণ্য-স্মৃতি—স্মৃতিতেই পর্য্যবসিত হইয়া রহিবে।

সেই সংসার-তপোবনের ঋষি বা স্বামী—শ্যাম-সুন্দর শর্ম্মা; ঋষি-পত্নী—তমালিনী দেবী। ছেলে-মেয়ে দুটির আদরের নাম—ধ্রুব ও তারা। ধ্রুবতারার বয়স— যথাক্রমে চার ও সাত। মেয়েটি বড়।

শ্যামসুন্দর অতি নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সন্তান; নিজেও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত। তবে আজিকালের সাধারণ ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ন্যায়, জীবিকা অর্জ্জনের জন্য সকল বিষয়েই উমেদারী করিয়া বেড়ান না,—অতি স্বল্পেই তুষ্ট। অগাধ শাস্ত্রজ্ঞান, অথচ অহমিকাশূন্য; তর্কতত্ত্বে সুপণ্ডিত, অথচ কুতার্কিক নন; মধুর মনোহর কোমলকরুণ কণ্ঠে অনর্গল সংস্কৃত-শ্লোক আবৃত্তি করিতে পারেন, কিন্তু লোককে তাহা জানাইবার প্রবৃত্তি আদৌ নাই;—স্বল্পভাষী ও সংযতবাক্,—বাচালতার ধার দিয়াও যান না—ধীর, গম্ভীর, অথচ অমায়িক ও বিনয়নম্র। সরলতায় বালকের স্বভাব। অথবা এখনকার বালক হইতেও বুঝি অকপট।—হঠাৎ দেখিলে কে বলিবে যে, এই আড়ম্বরহীন বাক্‌চাতুরীবিহীন দরিদ্র ব্রাহ্ম ণযুবকের হৃদয়ে—এত গুণ? কে বুঝিবে যে, এই পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ-বর্ষবয়স্ক—দিব্য গৌরকান্তি ও নধর রূপশ্রী-সম্পন্ন ভোগমূর্ত্তি—দেবমূর্ত্তিরই রূপান্তর?

হোক্,—দরিদ্র নিরীহ ব্রাহ্মণের ফল-পাকুড় বেশী চুরি বা তছরূপ হইত না।

বাগানে একটি মালি থাকিত। সেই-ই ফল পাকুড় বেচা-কেনা করিত। কিন্তু বৃক্ষ সজীব, সতেজ, ফলন্ত করিতে,—বাগান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পবিত্র রাখিতে, ব্রাহ্মণ নিজেই অক্লান্তকর্ম্মা ছিলেন। নিজে নিড়ুনি ধরিয়া, বৃক্ষমূলে জলসেক করিয়া, কোথাও আগাছা-কুগাছা জন্মিতে না দিয়া, তিনি নিজেই সেই সাধের উদ্যানটিকে দেব-উদ্যানে বা শান্তি-তপোবনে পরিণত করিয়াছিলেন। অতি প্রত্যূষে উঠিয়া তিনি সেই তপোবনে বেড়াইতেন, দেবপূজার জন্য পুষ্পাদি চয়ন করিতেন, গুন্ গুন্ স্বরে হরিগুণ গান করিতেন। প্রগাঢ় সুষুপ্তির পর এই শান্তি-জাগরণ তাঁহার বড় মধুর বোধ হইত।

নবনীরদবরণ শ্যামরূপ—ব্রাহ্মণের অন্তরে বাহিরে বিরাজ করিত। পক্ষীর কূজনে, ভ্রমর গুঞ্জনে, তরু-পত্রের মর্ম্মর ধ্বনিতে—তিনি তাঁহার প্রাণারাধ্য

হৃদয়-দেবতা শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিতেন। আধ-ফুটন্ত কুসুমকলিকা বৃক্ষের স্তবকে স্তবকে রহিয়াছে, তাঁহার মনে হইত, আর একটু পরেই সেই চিন্ময় দেবতা, সকলের অলক্ষ্যে আসিয়া, পদ্মহস্তে সেই কলিকা ফুটাইয়া দিয়া যাইবেন। অপরাজিতা বা তরুলতা ফুল একটির পর একটি ফুটিতেছে, তাঁহার মনে হইতেছে, সেই বিচিত্র বিশ্বকর্ম্মা—সেই অদ্ভুত চিত্রকর—আপন অতুল্য তুলিকা লইয়া বিবিধ রঙ্গিণ বর্ণে তাহা চিত্রিত করিয়া যাইতেছেন। প্রাতঃ-সমীরণের ধীরস্পর্শে, সদ্যপ্রস্ফুটিত কুসুমের মধুর আঘ্রাণে,তরুপত্রে মুক্তাফলসদৃশ শিশিরপাত সন্দর্শনে —তিনি সেই জগদারাধ্য জগদীশ্বরের মহিমা ধ্যান করিতেন।—এমনি ধর্ম্মময় মধুর জীবন, এমনি সাত্বিকতাপূর্ণ জীবনের উচ্চ ধারণা।

সেই মধুর জীবনে—সেই মাধুরিমময়ী সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর মধুর সম্মিলন—মণি-কাঞ্চনযোগ। সেই মণি-কাঞ্চনে, আবার সেই ধ্রুবতারারূপ ছুটি

হিরণ্ময় ফুল! যথার্থই শ্যামের সংসার—সংসার-তপোবন।

সংসারও তপোবন বটে, আর এই সজ্জিত—শত সাধে পরিপূরিত উদ্যানটিও তপোবন বটে। দুই দিকে দুই তপোবন,—আব সেই দুই তপোবনের মধ্যস্থলে ভক্তের জীবনধন—জীবনসর্ব্বস্ব—ত্রৈলোক্যসুন্দব—নবনটবব শ্যাম। শ্যামেব সেই শ্রীমূর্ত্তি—ভক্ত শ্যাম সর্ব্ববস্তুব ভিতর দিয়া অহর্নিশ দেখিতেছেন।

আর দেখিতেছেন,—তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনী দেবী তমালিনী। সেই পতিব্রতা সাধ্বী তাঁহার ইষ্ট-দেবতার শ্রীমূর্ত্তির সহিত ভগবানের এই মধুর মূর্ত্তি অভেদভাবে দেখিয়া নারীজন্ম সার্থক করিতেছেন অপরাহ্নে যখন তিনি তাঁহার প্রাণোপম ধ্রুবতারাকে লইয়া স্বামীর সহিত এই উদ্যান-তপোবনে আসিতেন, তখন প্রত্যেক তরুতে তিনি শ্রীকৃষ্ণের মোহন রূপ দেখিতেন,এবং সেই মোহনরূপের সহিত স্বামীর

মোহনরূপ দর্শন করিয়া বিস্ময়বিহ্বলভাবে এক একবার স্বামীকে সন্দর্শন করিতেন। ধ্রুবতারা তখন চঞ্চল হরিণ-শিশুর ন্যায় সে তপোবনের চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইত।

উদ্যানটি শ্যামের অন্দরের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত। সুতরাং তাহা একরূপ অন্দরেরই সামিল। সেখানে কুললক্ষ্মী সতী—নিঃসঙ্কোচে বেড়াইতে পারিতেন। সখের ভ্রমণ বা বায়ুসেবন নয়,—গৃহস্থালীর কাজ—দেবতার কাজও তিনি সেখানে করিতেন। স্বামীর শ্রম-লাঘবের জন্য—স্বামীর সহকারিণীরূপে সেখানে তিনি উপস্থিত থাকিতেন। নিকটস্থ পুষ্করিণী হইতে কলসে কলসে জল বহন করিয়া তিনি আনিয়া দিতেন,—দুই জন শ্রমসহিষ্ণু ভারবাহীর কাজ তখন তাঁহাকে করিতে হইত। সেই জল স্বামী স্ত্রী—ছিদ্র ঝারিতে করিয়া বৃক্ষের মূলদেশে অল্পে অল্পে অর্পণ করিতেন। এমন দুই চারিটি—দশটি বা বিশটি নয়,—শত শত

বৃক্ষে সেই জলসেচন কার্য্য চলিত। কোন বৃক্ষের আলি নূতন করিয়া গড়িতে হইত,—প্রয়োজনবোধে কোনটির আলি বা ভাঙ্গিয়া দিতেও হইত। এইরূপ পরিশ্রমে কখন বা স্বামী একটু ক্লান্ত হইয়া নিকটস্থ একটি বেদীতে গিয়া বসিতেন, কখন বা শ্রমশীলা সাধ্বী গুরুশ্রমে ক্লিষ্ট হইয়া শূন্য ঝারিহস্তে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। তখন সেই শ্রমক্লিষ্ট—ঈষৎ লজ্জারাগরঞ্জিত সাধ্বীর মুখমণ্ডলে যে পবিত্রশ্রী উদ্ভাসিত হইত, তাহা শ্যামই বুঝিতেন।

অপর পক্ষে, যখন সেই বরাঙ্গনা, কষিতকাঞ্চনা সাধ্বী মনের অনুরাগে অতি যত্নের সহিত বৃক্ষমূলে জলসেক করিতে থাকেন, তখন অদূরে উপবিষ্ট শ্যামের মনে হয়, যেন কোন তপোবনবাসিনী তপস্বিনী তাঁহার উদ্যানপর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, কিংবা কোন দেববালা ত্রিদিবের পথ ভুলিয়া, এই মর্ত্ত্যের কাননে আসিয়া, স্বর্ণঝারি হস্তে সস্মিতবদনে বৃক্ষে বৃক্ষে জলসেক করিয়া বেড়াইতেছেন।

ফলতঃ, তখন সতীর মুখে যে কমনীয় ভাব, যে পবিত্র দীপ্তি খেলে,—চোখে যে ঈষৎ হাসিমাখা সলজ্জ করুণ দ্যুতি বহিয়া যায়, তাহা না দেখিলে ঠিক্ বুঝা যায় না। দেখিয়াও সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে—তাহা হৃদয় স্পর্শ করে না।

এমনি পবিত্র বন্ধনে, প্রেমের মোহন ডোরে, শ্যামের সোনার সংসার আবদ্ধ। কৃষ্ণের মোহন-বাঁশী তথায় প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

এ চারু চিত্রের এইখানেই শেষ নহে। সহৃদয় পাঠক আমার হৃদয় লইয়া ধীরে ধীরে আমার অনুসরণ করুন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

চঞ্চল হরিণশিশুর মত ধ্রুবতারা সে নির্জ্জন তপোবনের চারিদিকে ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, কিন্তু অবাধ্য অশিষ্ট বালকবালিকার মত তপোবনের কোন অনিষ্ট করিতেছে না। কোন বৃক্ষের ফুল ছিঁড়িতেছে না, ফল পাড়িতেছে না, অথবা সেই শান্তি-তপোবনের শ্রী ও শোভা কোনরূপে নষ্ট করিতেছে না। বরং তাহাদের সেই উল্লাসময় জাগন্ত ভাব তপোবনকে অধিকতর আমোদিত করিয়া রাখিয়াছে। যেন ছুটি দিব্যশ্রী

মুনি-বালকবালিকা তরল হাস্যে, সরস ক্রীড়া-কৌতুকে, মনের সরল উচ্ছ্বাসে তপোবনের পবিত্রতা আরো বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছে। দূর হইতে পিতা সস্নেহ দৃষ্টিতে তাহাদিগকে দেখিতেছেন; মাতা মনে মনে অনেক ভাঙ্গা-গড়ার কল্পনা করিয়া হৃদয়ে নন্দনকাননের রচনা করিতেছেন।

আধভাষে ধ্রুব কহিল, "তালা, তুই অত দৌলুস-নি, পোলে যাবি।"

তারা ছুটিয়া আসিয়া ধ্রুবর দুই গালে দুই চুমা খাইয়া বলিল, "বটে, আমি তোমার তালা?—বল্ দিদি?"

"না, তালা।"

"আবার!—দিদী বোল্‌বি নে?"

"না, তালা।"—হো হো করিয়া বালক হাসিয়া উঠিল। একটা খেলা পাইয়াছে ভাবিয়া হাসিয়া উঠিল। সে হাসিতে সুধা ক্ষরিল।

বালিকা দেখিল, জোরে ধ্রুবর মুখ থেকে 'দিদী'

বার করা যাবে না,—তাই মিষ্টমুখে আদর করিয়া বলিল, "লক্ষী ভাইটি আমার! সোনা আমার! যাদু আমার! বলো তো ভাই—দিদি ?"

"না, তালা।"—বালক আবার হাসিয়া উঠিল।

বালিকা এবার তার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। আরো আদর করিয়া, ভুলাইয়া, তার দু'গালে চারিটি চুমা খাইয়া মধুমাখাস্বরে কহিল, "ছি ভাই, আমি তোমার বড়, আমার কি নাম ধোরে ডাক্‌তে আছে ?—বলো—দিদি !"

"না, তালা—তালা—তালা !"

হোহো করিয়া,কচি-হাতে তালি দিয়া,এবার ধ্রুব আরো জোরে হাসিয়া উঠিল। ভাবিল, খেলাটা বেশ জমিয়াছে,—'তালা' তাকে আরো আদর করিবে।

বালিকা তারা, তখন একটু অপ্রতিভ হইয়া, ধ্রুবের উপর রাগ করিয়া, মুখ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল,—আর কথা কহিল না।

ধ্রুব তখন ধীরে ধীরে তারার বস্ত্রাঞ্চল ধরিল, তারার সম্মুখে গিয়া তারার মুখের পানে চাহিল। সে মুখে স্নেহমাখা হাসি দেখিয়া, আরো কিছুক্ষণ খেলিতে পাইবে ভাবিয়া চাহিল। কিন্তু দেখিল, তারা আর হাসে না,—মুখখানা কেমন ভার করিয়া আছে!

দুগ্ধপোষ্য শিশুও অন্যের মনের ভাব বুঝিতে পারে। ধ্রুব বুঝিল, তাহার 'তালা'—তাহার উপর রাগ করিয়াছে।

তখন সেও একটু নরম হইয়া, হাসির বেগ মন হইতে বিদায় দিয়া, মমত্বের মধুরতম কণ্ঠে, আধভাষে কহিল, "অমন কোচ্চ কেন তালাদিদি?"

তারাও তখন একটু পাইয়া বসিল। অভিমান-ভরে কহিল, "না, আমি আর তোমার সঙ্গে কথা কবো না।"

"কেন ভাই তালা?"

"আবার?"

হি হি করিয়া সোনারচাঁদ ধ্রুব—সোনামুখে আবার হাসিল,—মুক্তাপাঁতির ন্যায় শাদা কচি কচি দাঁতগুলি বাহির হইয়া পড়িল,—অপরূপ শোভা ধারণ করিল।

ধ্রুব হাসিল, কেননা মনে বুঝিল, তাহার 'তালা দিদীকে' শুধু 'তালা' বলিলেই, সে রাগ করে। ভালবাসার জন—আপনার সাথীকে এমন একটু রাগাইয়া আমোদ হয় ভাবিয়া, ধ্রুব তাহার দিদীকে 'তালা' 'তালা' করিয়া অস্থির করিয়া তুলিল।

তারা বুঝিল, ধ্রুবকে অন্যমনস্ক করিতে না পারিলে, আজ আর তাহার রক্ষা নাই। কাজেই তখন সে, ধ্রুবকে কোলে লইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। না পারিয়া তাহার হাত ধরিয়া পাখী, গাছ, পালা, ফুল, ফল এই সব দেখাইতে লাগিল। এবং এই সব বিষয়ে ঘোরালো করিয়া অনেক কথাও বলিল। এমন কি, সেই সঙ্গে এক আধটা গল্পেরও অবতারণা করিতে হইল।

তখন ধ্রুব আগাড়-বাগাড়-সাগাড় বকিতে-বকিতে তার 'তালাদিদিকে' আকাশ দেখাইল, খানিকবাদে সন্ধ্যা হবে—তা বলিল, সেই সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদ উঠিবে, জ্যোৎস্না ফুটিবে, তারা দেখা দিবে— ইহাও বুঝাইল। শেষ বলিল, "হাঁ ভালা দিদি, তুইও তালা, আর ঐ আকাশের গায় যে উঠ্‌বে— সেও তালা ?"

সর্ব্বনাশ ! আবার ?—এ দুষ্ট ছেলে যে কিছু-তেই 'তালা' ছাড়িতে চায় না ?

তারাও বেগতিক বুঝিয়া সংক্ষেপে সে কথা সারিয়া বলিল, "হাঁ ধ্রুব, তোর সেই ধ্রুবর গল্পটি মনে আছে ?"

আধভাষে, সুধামাখা স্বরে ধ্রুব বলিল, "হ্যাঁ, সেই লাজার ছেলে ? সেই এক যে ছেলো লাজা— তাল দুই লাণী—সুনিতি আর সুলুচি। ধুবো বনে গে হালুমকে বলে—'হোলি, তুমি কি আমাল পদ্দলুম ?"

তারা এবার খুব সপ্রতিভ হইয়া উচ্চ হাসি

হাসিয়া উঠিল। সেইরূপ হাসিতে হাসিতে বলিল, —"পদতুলুম নয়,—পদ্মপলাশলোচন।"

ধ্রুব।—হুঁ, পদতুলুম!

তারা এবার ভারি খুসী; কেননা ধ্রুবকে হারাইতে পারিয়াছে। খুব খানিকটা হাসিয়া, সে তারপর সেইরূপ হাসি-হাসিমুখে কহিল, "ধ্রুব পদ্মপলাশলোচন বোল্‌তে পারে না, বলে—'পদতুলুম'। আর বাঘকে বলে হালুম।—আচ্ছা, বলো দেখি "আকাশ?"

"আচাশ।"

আচাশ কি? বলো—আকাশ।"

"আচাশ"।

"এ মাগো, ধ্রুব আকাশ বোল্‌তে পারে না?—বলে—আচাশ।—আচ্ছা বলো দেখি চন্দ্র।"

উচ্চ মধুর হাসি হাসিয়া ধ্রুব বলিল, "ও আমি জানি—একে চন্দোল, দুয়ে পক্ষ—"

তারা তখন ধ্রুবকে বুকে টানিয়া, সোহাগে

সাহ্লাদে তাহার মুখচুম্বন করিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটু ভয়ও হইল!—কি জানি, দুষ্ট ধ্রুব যদি ঐ আকাশ ও চন্দ্রের সঙ্গে আবার কথাও পাড়ে? তাহোলে তো এখনি আবার 'তালা তালা' করিয়া তাহাকে ক্ষেপাইয়া মারিবে?—অগত্যা বালিকা সে কথা চাপা দিয়া অন্য কথা পাড়িল, এবং তাহাই আলোচনা করিতে করিতে, ধ্রুবের হাত ধরিয়া পিতার সম্মুখীন হইল। একবার মনে করিল, বাপের কাছে নালিশ করিবে যে, ধ্রুব তাকে 'তালা' বলে; আবার ভাবিল, "থাক্, এখন আর ইহা তুলিয়া কাজ নাই,—ধ্রুব তা হোলে আরো পাইয়া বসিবে।"

স্নেহপ্রাণ পিতা সোনার চক্ষে এই সোনার খেলা দেখিতেছিলেন। স্নেহময়ী জননীও বৃক্ষমূলে জলসেক করিতে করিতে এক একবার এই দৃশ্য দেখিয়া অপার আনন্দ-সলিলে নিমজ্জিত হইতে-ছিলেন। শ্যাম ভাবিলেন, "এই আমার শান্তি-

সুতরাং, সাধারণতঃ তিনি ঠকিতে লাগিলেন। 'শিয়ান' সমাজে 'বোকা' হইয়াই ঠকিতে লাগিলেন। কিন্তু সে ঠকার ফলে, তিনি দুঃখিত নন। বরং যাহারা তাঁহাকে ঠকাইয়া লোকসমাজে উঁচু হইয়া উঠিতে লাগিল, তাহাদের আধ্যাত্মিক অবনতি ও অধোগতি দেখিয়া তিনি দুঃখিত হইলেন। ভাবিলেন, "আহা, ভগবান্ যাহাদিগকে সত্যধর্ম্মে বঞ্চিত করিয়াছেন, তাহাদের বাড়া দুঃখী আর কে? তাহারা আমাকে চাপা দিয়া দু'পয়সা অধিক উপার্জ্জন করিবে, না হয় স্থানবিশেষে একটু পসার বাড়াইবে—এই? কিন্তু সর্ব্বদর্শী তো আমায় দেখিতেছেন? তাঁর হাতে তো আমার ভাগ্যসূত্র আছে? তবে আর কি?"

ক্ষোভ বা বিকারের লেশমাত্রও মনে উদয় হয় না,—আত্মগৌরবে আপনি গৌরবমণ্ডিত রহিয়া উপেক্ষাবুদ্ধিতে তিনি সকলই উড়াইয়া দেন। মনে মনে কখন হাসেন, আর কখন বা মনুষ্যজীবনের

অসারতা উপলব্ধি করিয়া বিরলে অশ্রুবর্ষণ করেন।

এই যে উপেক্ষাবুদ্ধি ও উদারতা, এই যে আত্মপ্রতিষ্ঠায় উদাসীনতা,—তাহার প্রধান কারণ—আন্তরিক ধর্ম্মভাব ও গভীর ঈশ্বরানুরাগ। এই অপার্থিব অমূল্যনিধির অধিকারী যে, সে সংসারের তুচ্ছ সুখদুঃখ, ক্ষুদ্র মান অপমান—গণনায় আনিবে কেন?

তা ছাড়া আর এক কারণও আছে। যে সংসারসুখের মরীচিকায়, স্ত্রী-পুত্রের মায়ায়, মানুষগুলো দিক্‌ভ্রান্ত হইয়া খেয়োখেয়ি করিয়া মরে,—সে কষ্টকল্পিত সুখ অপেক্ষা—প্রত্যক্ষ খাঁটীসুখ তাঁহার আয়ত্তেই আছে। সে পরমসুখ যে ভাগ্যবান্ আপনা হইতে লাভ করে, তাহার কিসের অভাব? ঋষিকল্প শ্যামসুন্দর—পিতৃপুণ্যে, জন্মার্জ্জিত সরলতা ও সত্যনিষ্ঠাগুণে, আপন ক্ষুদ্র সংসার তপোবনেই, সে সুখলাভ করিয়াছেন।—তাঁহার বাড়া ভাগ্যবান্ আর কে?

সে ভাগ্যের কথা প্রথমেই বলিয়া আসিয়াছি। সে সুখের ছবি, সর্ব্বাগ্রেই শব্দ-চিত্রে অঙ্কিত করিয়াছি। এইবার ধীরে ধীরে তাহার ক্রমবিকাশ দেখাইব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সংসার-তপোবন। বড় উঁচু কথা, বড় শক্ত কথা। আজকালের পক্ষে একরূপ অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেন না, আমাদের আশেপাশে চারিদিকেই এখন কৃত্রিমতা, বিলাসিতা,—পাপের পঙ্কিল ছবি। তথাপি ইহা সত্য। ভগবানের রাজ্যে 'আদর্শের' কখন বিলোপ হয় না। বিশাল, বিরাট্ হিন্দু-সমাজ। ইহার কোথায়, কোন্ স্থানে, কি ভাবে, কোন্ অমূল্যরত্ন লুকানো আছে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। সহরে,

নগরে, বর্দ্ধিষ্ট জনপদে পাইলে না বলিয়া নিরাশ হও কেন? খুঁজিতে জানিলে ওখানেও পাইবে। অজানা—অচেনা দূর পল্লীর মধ্যেও পাইবে। হয়ত আপনার মধ্যেও পাইবে। হায়! আমরা চোখ্ থাকিতে অন্ধ; তাই আমাদের এত দুর্দ্দশা!

যে তমাল-তরুর শীতল শ্যামচ্ছায়ায় ভক্তের প্রাণারাধ্য, ব্রজাঙ্গনার বাঞ্ছিতধন চিরবিরাজিত,—সেই পুণ্যস্মৃতি স্মরণ করিয়া এই তপোবনটি ভাবিলে ভাল হয়। আর কিছু না হউক, গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ স্বরূপ কল্পতরুর কল্যাণময় নামের সহিত সেই স্মৃতিটি জড়িত থাকিবে।

যে শ্যামসুন্দরের মোহন মুরলীস্বরে ব্রজাঙ্গনা ছুটিয়া আসিত, যমুনায় উজান বহিত, শুষ্কতরু মুঞ্জরিত পল্লবিত কুসুমিত হইত, সেই বংশীধারী নবনীরদবরণ ভুবনমোহন শ্যামসুন্দরের শ্রীপাদ-পদ্মে আমাদের এই ক্ষুদ্র আখ্যায়িকার নায়ক শ্যামসুন্দরের সোনার সংসার বা শান্তি-তপোবন

উৎসৃষ্ট। স্বয়ং গৃহস্বামী উৎসৃষ্ট, তাঁহার সাধ্বী সহধর্ম্মিণী উৎসৃষ্ট, তাঁহার শিশু পুত্রকন্যা ধ্রুবতারা উৎসৃষ্ট। সুতরাং সে সংসার—দেবতার সংসার বা শান্তি-তপোবন না হইবে কেন?

সেই দেবতার সংসারে—শান্তি-তপোবনে, তমাল-তরুর ছায়ারূপিণী তমালিনীর পার্শ্বে, ধ্রুব-তারা নামে যে দুইটি ফুল্ল-ফুল ফুটিয়া আছে, ত্রিদিবের শোভাও বুঝি তাহার নিকট পরাভব স্বীকার করে। মধ্যে তরুবর, সেই তরুগাত্রে জড়িত কনক-লতা, আর সেই লতায় প্রস্ফুটিত দুটি সোনার কমল। অতি পবিত্র দৃষ্টিতে, ভাবের চোখ্ লইয়া তাহা দেখিতে হইবে।

কষিতকাঞ্চনা তমালিনীর সোনার দেহে রূপ আর ধরে না। রূপ—সে বরবপু হইতে যেন উপ্‌চিয়া পড়িতেছে। তথাপি রূপের জ্যোতির্ম্ময়ী-মূর্ত্তি চারিদিক্ হইতে জমাট বাঁধিয়া তাঁহার শ্রীঅঙ্গে মিশিতে যেন অতিমাত্রায় আগ্রহ প্রকাশ

করিতেছে। স্থিরযৌবনা, স্বভাবসৌন্দর্য্যভূষণা ষোড়শী সুন্দরী অপেক্ষাও সুদর্শনা তিনি।—দেখিলে কে বলিবে যে, বয়স ইহাঁর ত্রিশের কাছাকাছি,—দুই রত্নগর্ভার জননী ইনি। অধরের লুক্কায়িত হাসি, চক্ষের কোমল করুণ পবিত্র দৃষ্টি, মরাল-গ্রীবার কমনীয় কুঞ্চিত রেখা,—চকিতে একবার দেখিলেই মনে হইবে যে, সাধারণ সংসার-উদ্যানে ইহা সাজে না,—ত্রিদিবে বা তপোবনেই এ কনক-লতা শোভা পায়।

সেই কনক-লতিকা—শ্যাম-তমালতরুকাণ্ডে জড়াইয়া চলিয়াছে,—ঠিক মধ্যস্থলে দুটি ডাগর হিরণ্ময় ফুল ;—সদ্য-প্রস্ফুটিত, সজীব, সৌগন্ধময়। —সবটা জড়াইয়া এইবার একবার ভাবো দেখি—এমন অপরূপ রূপ-মন্দিরে দেবতা ভিন্ন আর কোন্ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হয়? সৌন্দর্য্যে, শোভায়, সৌরভে—এমন ফুল কি এ মর্ত্ত্যে ফুটে? দেব-ভোগ্য সুধা স্বর্গেই সঞ্চিত থাকে।

ভাগ্যবান্ শ্যামসুন্দরের সংসারও স্বর্গ, সুধাও ত্রিদিবের, ফুলও নন্দনকাননের। সেই শ্রীনন্দ-নন্দনের শ্রীপাদপদ্মে এ সমস্তই সংস্পৃষ্ট,—তাঁহার নিজের বলিতে কিছুই নাই। দেবতার জিনিস,—দেবভাবাপন্নই হইয়া থাকে। তাই তাহার সংসার—দেবতার সংসার; তাঁহার সজ্জিত উদ্যান—শান্তি-তপোবন; তাঁহার পুত্র-পরিবার—নারায়ণের সম্পত্তি; আর স্বয়ং তিনি—তাঁহার দাস।

এমন মহান্ ভাব ও উচ্চধারণা যাঁর, তিনি শঠের শঠতায় বা প্রবঞ্চক-কুক্কুরের কপটতায় মনঃক্ষুণ্ণ হইবেন কেন? গৃহে যাঁর অমন অমূল্য-নিধি,—অমন বুক-জুড়ান প্রাণ-মাতানো সম্পত্তি,—অমন স্বর্গের শোভা;—তিনি বাহিরের বা বাজারের ঝুটা মান বা কিঞ্চিৎ অর্থ লইয়া বিব্রত হইবেন কেন?

প্রকৃতই, গৃহের আকর্ষণ যার নাই, সে অতি-বড় হতভাগা। সে আকর্ষণে যে, সকল প্রয়োজন

ভুলিতে না পারে,—কাকবিষ্ঠাবৎ সমস্তই পরিত্যাগ করিতে সমর্থ না হয়, তাহার গৃহাশ্রমে থাকাই বিড়ম্বনা।

ঋষিকল্প শ্যামের সংসার-তপোবনে যে দুই বস্তু ছিল,—যাহার ধ্যান ও ধারণায় সত্যসত্যই তিনি সংসারে নন্দনকাননের রচনা করিয়াছিলেন, তাহার জন্য তিনি কি না করিয়াছেন,—কি না করিতে পারেন? তাঁহার শিক্ষা—আদর্শ শিক্ষা; তাঁহার সংস্কার—বিশুদ্ধ জ্ঞানগর্ভ সংস্কার। তিনি সার বুঝিয়াছিলেন, সুখ ধনে নহে,—মনে। তাঁহার সাধ্বী সহধর্ম্মিণীও শিক্ষা পাইয়াছিলেন,—বিলাসিতা পাপ, ব্রহ্মচর্য্যই পুণ্য। তাঁহাদের সেই দুই সোনার চাঁদ—ধ্রুব ও তারা—তাহারাও মধুমাখা আধ-আধ স্বরে বৈরাগ্যের নিবৃত্তিমার্গ—সুর করিয়া আবৃত্তি করিত,—

"যাবজ্জনমং তাবন্মরণং তাবৎ জননী জঠরে শয়নং।"

দূর হইতে পুণ্যপ্রাণ পিতা হাসি-হাসি মুখে

ইহা দেখিতেন; পুণ্যপ্রতিমা স্নেহময়ী জননী ছলছল চোখে ইহা দেখিয়া অন্তরে একটু দ্রব হইতেন। পিতাকে দেখিয়া ধীরা পিতার কাছে ছুটিয়া যাইত; মাতাকে দেখিয়া ধ্রুব মাতার কোলে গিয়া উঠিত। পরে চারিজনে একত্র কাছাকাছি হইলে—সেই তমালতরু, সেই স্বর্ণলতিকা, সেই দুই ফুটন্ত হিরণ্ময় ফুল—আমার চোখের সাম্‌নে ভাসিয়া আসে। মনে হয়, হায়! এমনটি কি আর দেখিব? হিন্দুর সংসারে আবার কি সে সুখের দিন ফিরিয়া আসে না? সেই শান্তি, সেই পবিত্রতা, সেই সন্তোষ, সেই স্বর্গীয় গার্হস্থ্য ছবি—হায়! আর কি দেখিতে পাইব না? কোন্ পাপে, কার অভি-শাপে, সে সোনার স্বপ্ন অন্তর্হিত হইয়াছে,—ভগবান্ তুমিই জানো?

তপোবনের স্বামী শ্যাম—চিত্তশুদ্ধি ও তপো-বনের পবিত্রতা রক্ষার জন্য দেবগৃহের সম্মুখে বসিয়া যখন ভক্তিবিগলিত অন্তরে সুস্পষ্ট সুধামাখাস্বরে

সামবেদ গান করিতেন, তখন তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া পবিত্র প্রেমাশ্রু প্রবাহিত হইত, আর তাঁহার মনোরমা ধর্ম্মপত্নী—ভক্তিমতী ঋষিপত্নীর ন্যায় বিশুদ্ধ পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া তাঁহার পদতলে বসিয়া সেই বেদগাথা শ্রবণ করিতেন। ভক্তিতে তাঁহার হৃদয় রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত, চোখে জল আসিত। সেই জলভরা চোখে, অনিমেষ নয়নে, তখন তিনি তাঁহার পতিদেবের শ্রীমূর্ত্তি দেখিতেন, আর এক একবার সেই সজল চক্ষু ফিরাইয়া সম্মুখস্থ সিংহাসনোপরি স্থাপিত—স্বামীর ইষ্টদেবতা শ্যাম-সুন্দরের বিগ্রহমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতেন। একসঙ্গে দুই শ্যামের মনোমোহনমূর্ত্তি দর্শন;—কোন্ শ্যাম তখন তাঁহার চক্ষে অধিকতর সুন্দরবোধ হইত, তাহা তিনিই জানিতেন,—মুখ ফুটিয়া সে কথা তিনি কাহাকেও বলিতে পারিতেন না।

তপোবনের এই শোভা;—সে শোভার সহিত আবার সোনারচাঁদ ধ্রুব-তারার তৎসময়োচিত

নির্ব্বাক্ অচঞ্চল কমনীয় ভাব ;—মাতৃমন্ত্রে তাহারাও যেন তন্ময় ও তদ্গতচিত্ত হইয়া, মায়ের দুই পার্শ্বে অবস্থিত থাকিয়া, তপোবন আলোকিত করিয়া আছে।

সম্মুখে সিংহাসনোপরি শ্যামসুন্দরের মধুর মনোহর দেবমূর্ত্তি, তৎসম্মুখে অবস্থিত তপোবন-স্বামী নৈষ্ঠিক ভক্ত শ্যামের গদগদকণ্ঠে বেদগান, পার্শ্বে লক্ষ্মীস্বরূপিণী পতিব্রতা তমালিনীর ধ্রুবতারা-সহ সেই গান শ্রবণ,—আত্মনিমজ্জন,—মধ্যে মধ্যে সজল অনিমেষ নয়নে সেই দুই দেবদরশন।—স্বর্গ আর কোথায়? বৈকুণ্ঠের শোভা আর কোন্ লোকে?

এইরূপ ত্রিদিবের সুষমা ছড়াইতে ছড়াইতে, সেই তপোবন আপন আলোকে আপনি আলোকিত হইয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া কাহারো চক্ষু ফুটিল, কাহারো বা চক্ষু টাটাইল, আর কেহ বা চক্ষু মুদ্রিত করিল।

তা যার যেমন ইচ্ছা, করুক ; যে যেমন ভাগ্য লইয়া আসিয়াছে, করিতে থাকুক ;—সময়স্রোত ফিরিবেই ফিরিবে। সে সময়ে, হে সময়স্রোতের নিয়ন্তা ! একবার প্রসন্ন দৃষ্টিতে ফিরিয়া চাহিও ; —হয়ত তোমার কৃপায় এ ভাঙ্গা-ঘর জোড়া দিয়া, আবার তোমার নাম-গান করিয়া, জন্ম সফল করিতে পারিব।—'জয় করুণানিধান রামকৃষ্ণ !'

অদূরে বহির্ব্বাটীর পরিষ্কৃত প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া, এক ভিখারী বৈষ্ণব একতারা বাজাইয়া, বাউলের সাধা-সুরে অতি পবিত্র মধুর কণ্ঠে গান ধরিল,—

'রামকৃষ্ণ-নাম গাওরে মনের হরষে।
ও মন, ঘুচ্‌বে জ্বালা, হবি ভোলা,
থাক্‌বিনে আর বিরসে॥
ভাবনা যে রে সমুদ্রবিশেষ,—
কূল-কিনারা না যায় জানা, কোথায় বা তার শেষ ;—
কাজ কিরে ছাই, অমন বালাই, বিদেয় দেনা তায় হেসে

তোর ভাবনা ভাব্‌চেরে সেই জন,

দিনান্তে যারেরে ডাকিস—'পতিত পাবন,

(বোলে)—

কোথা হে কাঙ্গালের ঠাকুর, দেখা দাও একবার এসে ॥

অমন প্রেমের ঠাকুর হবেনারে আর,

তোর মন বুঝেরে, ধন জোগায় সে, কিবা চমৎকার,

তারে, বোল্‌তে হয় কি কোন কথা, ভেবে দেখ্‌ দেখি

সর্ব্বনেশে ॥'

গায়ক গান গাহিতেছে, আর তাহার দুই গণ্ড বহিয়া ঝর ঝর ধারে প্রেমাশ্রুপাত হইতেছে। কোন দিকে দৃষ্টি নাই, কাহারো পানে লক্ষ্য নাই, —তদ্গত ও তন্ময়চিত্ত হইয়া ভাববিভোর প্রাণে গাহিতে লাগিল,—

"ভাবের ঘরে কোরিসনে চুরি।'

এইটে তিনি বিশেষ কোরে কোরেছেন জারি ;—

তাতে পদে পদে কি ঝক্‌মারি,

জ্বোল্‌তে হয় রিষের বিষে ॥

'ব-কল্‌মা'রে দিয়ে তাঁর পায়,
সকল বাঁধন ছিঁড়ে ছুড়ে উধাও হোয়ে আয়,
তাতে শান্তি পাবি, বেঁচে যাবি, বেড়াবি দেশ-বিদেশে ॥
রামকৃষ্ণ আমার গুপ্ত অবতার,
গুপ্তকথা ব্যক্ত হোলো, ইচ্ছেতে তাঁহার,
আবার, শুন্‌ছি এবার আস্‌বেন তিনি,
আরো কাঙ্গালের বেশে ॥
(কাঙ্গাল জীবের উদ্ধারতরে, পতিত জীবের পারের তরে,
পাপী তাপীর মুক্তি তরে)

সুরের মাঝে সুর জমাট বাঁধিল। সুরে সুরে দিক্ ছাইয়া ফেলিল। ললিতে মধুরে, কোমলে গম্ভীরে —সুর হাসিয়া ভাসিয়া তরঙ্গায়িত হইয়া চলিল। ভক্তের শ্রীমুখনিঃসৃত সাধনসুর; তাহার প্রভাব বড় সাধারণ নয়,—সেই সুর জমাট বাঁধিয়া চলিল অন্দরে বেদগানের গম্ভীর ঝঙ্কার, সদরে বাউল-কীর্ত্তনে সুধার সঞ্চার;—এ সময় কোথা তুমি সর্ব্বসৌন্দর্য্যের আধার—সর্ব্বমূলাধার—প্রাণবল্লভ

বংশীধারী !—তোমার সর্ব্বসন্তাপহারী প্রাণপবিত্র-কারী সাধের বাঁশীটি একবার বাজাও ;—আমি মুদিত চক্ষে তোমার ঐ নবঘনশ্যাম নটবর মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে—ভাবের কান লইয়া তাহা শুনি,—জন্ম সার্থক করি ! আর এ ব্যথিত প্রাণ লইয়া, বেসুরা সংসারে যুঝিতে পারিনা দয়াময় !

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্যামের সংসারে, রাধাকৃষ্ণের মিলন-মন্দিরে, যে স্বর্গের শোভা দেখিলাম, মনে হয়, এখন সকল ভুলিয়া, সকল ফেলিয়া, দিনরাত এই শোভাই দেখি ;—কিন্তু কালরূপী কর্ম্মজাল,—লূতাতন্তুর মত আপন জালে আপনি জড়াইয়াছি,—সাধ্য কি, এ জাল ছিন্ন করি ? সংসার হাসিল, সমাজ ভ্রুকুটি করিল, স্ত্রীপুত্র বাধা জন্মাইল,—মায়ার খেলনা—মোহের খেলাঘর—টানিয়া জড়াইয়া ধরিল,—শক্তি কৈ, যে ইচ্ছাসত্ত্বেও এদের হাত

এড়াই ? অভাবে পড়িয়াই হোক, আর স্বভাবের টানেই হোক্,—তুমি আমি বা আর সকলে—যে নিবৃত্তির পথ ধরিব,—সুখে দুঃখে সংসার-ধর্ম্ম পালন করিব,—ধর্ম্মের সংসার পাতিব, সে পুণ্য ও প্রতিষ্ঠা কৈ ? হায় ! সে আদর্শই বা কোথায় ?

ভক্ত ও ভাবুক বলিলেন,—'আদর্শ এই বিচিত্র বিশ্বরচনা,—আদর্শ স্বয়ং সেই বিশ্বপতি বিশ্বেশ্বর। কিন্তু সকলের মূল—মন। কেন না মনই নারায়ণ।' —তাই কি ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব জীব-শিক্ষার জন্য স্বয়ং সশরীরে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ? তাই কি তিনি জীবনে ও কার্য্যে—প্রতি পাদক্ষেপে দেখাইয়া গিয়াছেন, সংসারী লোকও ভগবান্ লাভ করিতে পারে ;—আমাদের মত ক্ষুদ্র গৃহীও তাঁহার চরণ-সরোজে নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে সমর্থ হয় ?

কিন্তু একটি বড় ঐ বিষম কথা যে, সম্যক্‌রূপে কর্ত্তৃত্বাভিমান বর্জ্জন করিতে হইবে,—'দাস-আমি'

হইয়া থাকিতে হইবে! তোমার দাস নয়, আমার দাস নয়, পার্থিব রাজার দাস নয়,—শ্রীভগবানের দাস হইতে হইবে। বাস্, তা হইলেই—ছুটি!

ভাগ্যবান শ্যামসুন্দর কি সেই ছুটি পাইয়াই নিশ্চিন্ত আছেন? যদি তাই হয়, তবে তোমায় আমায়ও এস না কেন ভাই,—ঐ ছুটী লইয়া নিশ্চিন্ত হই? এতে পয়সা ব্যয় নাই, কোন খরচ-পত্র নাই, শারীরিক ও মানসিক শ্রম নাই, পরের উপাসনার দরকার হয় না,—এস না কেন—ঐ মুক্তি-মন্দিরে বসিয়া সকল বাঁধন ছিঁড়িয়া ফেলি?

কর্ম্মশক্তি কমিয়া যাইবে ভাবিতেছ? পার্থিব উন্নতির অবসান হইবে ভাবিয়া ভীত হইতেছ? আচ্ছা, অনেক দিন ধরিয়া তো আঁকু-পাঁকু, ছুটোছুটি, দৌড়-দৌড়ি করিলে,—এখন দিন কত একটু ঠাণ্ডা হইয়া দেখ দেখি,—কে জিতে আর কে হারে,—আর কেহ বা সুখী হয়?

জগৎ যুড়িয়া অশান্তি ও হাহাকার! দানবা ক্ষুধা সকলকে অধীর, অস্থির, উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে। কেহ কাহাকে বিশ্বাস করে না, কেহ কাহারও ভাল দেখিতে পারে না, কেহ কাহারও প্রতিষ্ঠায় সুখী নয়।—কত দিন ধরিয়া আর এ খেয়োখেয়ি, কাম্‌ড়া-কাম্‌ড়ি ও রক্তপাত করিয়া মরিবে? মনে করিও না যে, উটি ভাল, আর ইটি মন্দ। ভাল করিয়া একটু অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিও, ঐ দুই সমান—সেই হিংসা-দ্বেষ-কলহ,—সেই বন্য বর্ব্বর পাশব ভাব,—সেই স্বার্থসিদ্ধি চেষ্টা ও ঐহিক সুখে উন্মত্ততা,—সেই পরপীড়ন, পরকৃতিত্বগোপন, কূট কৌশল প্রভৃতি নারকীয় অভিনয়—সমাজের উচ্চস্তরে ও নিম্নস্তরে—সকল সম্প্রদায়েই সমানে চলিতেছে। একটু বুদ্ধির মারপেঁচ, একটু লোকচক্ষে ধূলি-দেওন, একটু পালিস-করা সভ্যতার চাক্‌চিক্য—এই মাত্র যা প্রভেদ। পাপরূপ পারা যখন

সকলকেই খাইতে হইয়াছে, তখন তাহার ঘা কাহারো ধরিয়াছে, কাহারো ধরি-ধরি হইয়াছে,—আর কাহারো বা রীতিমত ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। মেলো, মেশো, ভাল করিয়া দেখ,—স্বীকার করিতেই হইবে, যাহা বর্ণিত হইল, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য। তখন, পরের দোষ আর লইবে কি,—আত্মজীবনেই ধিক্কার জন্মিবে, আপনার ছায়ায় আপনি চমকিত হইবে,—আপন মনের ভাব নিবিষ্ট মনে ভাবিয়া আপনিই শিহরিয়া উঠিবে। যদি মানুষ হও, তো অন্তরের অন্তরে তপ্তশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে তখন নিশ্চয়ই বলিবে,—'হরি হরি! এই—আমি? এর এত বড়াই?'

সমাজ ও সংসারের যখন এই ভীষণ অবস্থা, তখন একমাত্র শ্রীভগবানকে আদর্শ করিয়া নির্জ্জনে আপনাকে গড়িতে হইবে। নির্জ্জনে মন তৈয়ারী করিয়া ঐ নিরীহ ধর্ম্মপ্রাণ শ্যামসুন্দরের মত স্বল্পে তুষ্ট হইয়া ভগবৎ-পাদপদ্মে আপনাকে

উৎসর্গ করিতে হইবে। তা ভিন্ন আর গতি নাই। ধর্ম্মভীরু, ঈশ্বরবিশ্বাসী হওয়া ভিন্ন জীবের আর শান্তি নাই। যাঁহারা এ পথের পথিক—তাঁহারা খুব প্রচ্ছন্নভাবেই আছেন জানিও। তাঁহাদের সংবাদ কেহ রাখেন না, রাখিতে ইচ্ছা করেন না, রাখা অপমান বোধ করেন। অথচ তাঁহাদের পুণ্যেই আজিও সংসার আছে, আজিও সমাজ রহিয়াছে,—আজিও একটু আধটু ধর্ম্মকর্ম্ম চলিতেছে। কিন্তু হায়! আর বুঝি থাকে না,—দাবানলে পড়িয়া, বুঝি সকলই ভস্মীভূত হইয়া যায়। তাই বড় ক্ষোভে—বড় সন্ত্রাসে—নিরাশার গাঢ় অন্ধকারে, আশার এই ক্ষীণরশ্মি প্রজ্বালনে প্রয়াসী হইয়াছি।

তপোবন-স্বামী শ্যাম—সাধ্বী সহধর্ম্মিণী ও শিশু পুত্রকন্যা লইয়া, যে মনের সুখে দিন কাটাইতেছেন, উপরে তাহার দুই একটি মাত্র ছায়াচিত্র অঙ্কিত করিয়াছি; কিন্তু বলি নাই

যে, কিরূপে তাঁহাদের জীবিকা অর্জ্জন হয়,—কিরূপে তাঁহারা সংসারধর্ম্ম পালন করেন।

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সন্তান, শ্যাম নিজেও দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত। তবে এ দারিদ্র্যে নীচতা নাই, আত্মসম্মানবোধের অভাব নাই, কোন রূপ 'উঞ্ছ-বৃত্তি'ও নাই। সুখে, সমাদরে নারায়ণকে শাকান্ন ভোগ দিয়া, তাহাই তিনি পরম পরিতোষ পূর্ব্বক সপরিবারে আহার করেন,—ইহাপেক্ষা উত্তম আহারীয় বস্তু আর আছে বলিয়া তাঁহার মনে হয় না। কেন না, স্বয়ং শ্রীভগবান্ যাহা প্রসাদ করিয়া দিয়াছেন, তাহা অমৃত, ভক্তের ইহাই প্রগাঢ় বিশ্বাস। অন্যত্র, সমাজে বা পরগৃহে তাঁহার নিমন্ত্রণ হইলে, তিনি সেই নিমন্ত্রণ রাখিতেন মাত্র,—আহার করিতেন না। একাহারী নিরামিষী তিনি; স্বপাক ছাড়া অন্যত্র আহারের সুবিধাও হইত না।

আহারে এই যেমন নির্লোভিতা ও সংযম, বিহারে ও পরিচ্ছদে সংযম আবার ততোধিক।

একখানি কাষায় বস্ত্র তদুপযোগী একখানি কাষায় উত্তরীয়—এইমাত্র। পিরিহান ও পাদুকা কস্মিন্-কালে তিনি ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু তাহাতেই ব্রাহ্মণের সেই তপ্তকাঞ্চনপ্রভ শ্রীঅঙ্গ সমধিক শোভায় শোভিত হইত।

অন্তর যাহার সুন্দর, বাহিরও তাহার সুন্দর হয়। যে বেশে যেমন ভাবে সে থাকুক না, তাহাতেই তাহাকে সুন্দর দেখায়। সৌন্দর্য্যের মনোময়ী মূর্ত্তি আপনি ফুটিয়া বাহির হয়,—তাহাকে আর সাজাইয়া দেখাইতে হয় না। যাহার সাজিবার সৌভাগ্য আছে, সে সাজুক; কিন্তু যাহার তাহা নাই, তাহার ক্ষুণ্ণ হইবারও কোন কারণ নাই। রূপজীবিনী বারাঙ্গনা কত যত্ন-আয়ত্ত করিয়া, কত কৃত্রিম বেশভূষা পরিয়া, কত হাবভাব দেখাইয়া, আপন রূপের হাট খুলিয়া বসে; তথাপি ধীমান্ ব্যক্তি তাহার পানে ফিরিয়াও চান না, পরন্তু সাধ্বী সীমন্তিনীর সীমন্তের একটি মাত্র সিন্দুর-বিন্দুও

পরিধেয় একখানি সামান্য কস্তাপেড়ে সাড়ীতে তিনি যে সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতা দেখেন, তাহার তুলনা হয় না।

শ্যামের সেই ধর্ম্মময় সরস জীবন, জীবনের সেই মধুর ভাবভঙ্গি,—মানসদর্পণস্বরূপ সেই উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় যোগচক্ষু, সেই জ্ঞানগম্ভীর অথচ সরল সহাসবদন,সেই সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত দেবঅঙ্গ—যে দেখিতে জানিত, তাহার মনে আর ব্রাহ্মণের সে পরিচ্ছদের দীনতার কথা আদৌ উত্থিত হইত না।

শ্যামের সহধর্ম্মিণী—দেবী তমালিনীও, এ সকল বিষয়েই স্বামীর আদর্শ গ্রহণ করিতেন। অলঙ্কার বা উত্তম বস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা তিনি আদৌ উপলব্ধি করিতেন না। শিশু পুত্রকন্যাটিকেও এখন হইতেই তিনি ঐ বিলাসবর্জ্জিত ব্রহ্মচর্য্যের ভাবে গঠিত করিয়া তুলিতে লাগিলেন। সাত্ত্বিক ভাবময় পিতামাতার সন্তান—শৈশবেই ধর্ম্মের মধুর মোহন-ছবি দেখিল, সেই ছবিতেই আকৃষ্ট হইল, ইহাপেক্ষা

যে উৎকৃষ্ট মনোমোহন ছবি আর থাকিতে পারে, তাহা তাহাদের ধারণায়ও আসিল না। দরিদ্র পিতৃগৃহের ক্ষুদ-গুঁড়া তাহারা চাঁদপানা মুখ করিয়া খায়; অনাড়ম্বর সাদা-সিদা বেশভূষা হৃষ্টচিত্তে পরিধান করে; সামান্য শয্যায় শুইয়া পরমসুখে নিদ্রা যায়;—সে এক বিপুল সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ সন্তোষ। অসন্তোষের কালো মেঘ কখন তাহাদের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিত না। এমন কি, ক্রীড়াকৌতুক ও আমোদপ্রমোদের সময়ও তাহারা দেবদেবীর শান্তিময় লীলামৃত অভিনয় করিত।—সে এক মধুর শিক্ষা, সে এক অপূর্ব্ব ধর্ম্মবন্ধন।—সেই বন্ধন শিথিল হওয়াতেই না আজ দেশময় হাহারব পড়িয়া গিয়াছে?

ব্রাহ্মণের বাস্তুগৃহের সংলগ্ন—পুরুষানুক্রমিক একটু ব্রহ্মোত্তর জমি আছে। সেই জমিটুকুই ব্রাহ্মণের লক্ষ্মী। পল্লীজননীর স্নেহধারা-সমুদ্ভূত এই উর্ব্বর শস্যশ্যামল ক্ষেত্রটিকে অবলম্বন করিয়া,

ব্রাহ্মণ বড় সাধে—বড় যত্নে—বড় তপস্যায় তাঁহার পুণ্যাশ্রম সংসার-তপোবনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।—সে তপোবনের চারুচিত্র, ধীরে ধীরে অতি সাবধানে আমাকে অঙ্কিত করিতে হইতেছে।

শাস্ত্রে সম্যক্ পারদর্শী হইলেও, শ্যাম—শাস্ত্র-ব্যবসায়ী নন। কেমন তাঁহার বাল্যকাল হইতেই ধারণা জন্মিয়াছিল, ব্যবসায়ী হইলেই বাচাল বা পাটোয়ারী বোদ্ধা হইতে হইবে; প্রতিদ্বন্দ্বীকে যেন-তেন প্রকারে লঘু প্রতিপন্ন করিতে ইচ্ছা যাইবে; সর্ব্বদা আপন পসার ও প্রতিপত্তিরক্ষার জন্য ঝুটা ভাবের দোকান খুলিয়া রাখিয়া লোককে ঠকাইতে হইবে;—আরো কত রকমে যে মনুষ্যত্বকে জলাঞ্জলি দিয়া পশুত্বের পূজা করিতে হইবে—তাহার ইয়ত্তা নাই।—তাই দূরদর্শী ব্রাহ্মণ, প্রকৃত ব্রাহ্মণোচিত সদ্বুদ্ধির আশ্রয়ে, প্রথমেই স্বাধীনভাবে শাকান্নের সংস্থান করিয়া, আপনার মনুষ্যত্ব রক্ষা করিলেন। কাহারো গলগ্রহ বা

অনুগ্রহভাজন না হইয়া পিতৃপুরুষের আশীর্ব্বাদ-দানস্বরূপ ঐ পতিত জমিটুকু অবলম্বন করিয়া আপনার ভাগ্যলক্ষ্মী অর্জ্জন করিলেন। সামান্য জমির সামান্য আয়,—কিন্তু তাহাতেই সেই ঈশ্বরজানিত ধার্ম্মিকদম্পতী মনের গুণে সোনার সংসার প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অতি পবিত্র চক্ষে, ধীরভাবে সে সংসার দেখিতে হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

জমির একখণ্ডে একটি ক্ষুদ্র বাগান। সে বাগানটি দেখিলে মনে হয়, যেন একটি দেব-উদ্যান। চারিদিক এমনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, এমনি পবিত্রতা-ময় ও পদ্মগন্ধপূর্ণ, যে মনে হয়, দেবলোক ও ঋষিলোক হইতে সত্ত্বগুণাবলম্বী মহাত্মারা আসিয়া তথায় নির্জ্জনবিহার করেন, ব্রাহ্মণের তপোবলের প্রভাব দেখিয়া তাঁহাতে আকৃষ্ট হন, অলক্ষ্যে তাঁহার মস্তকে আশীর্ব্বাদবারি সিঞ্চন করিয়া তাঁহাকে অটল ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ করেন,—

ঈশ্বরের অধিকতর সান্নিধ্যে তাঁহাকে লইয়া যান।—সে এক অতি সূক্ষ্ম পারমাত্মিক যোগ।

স্থূলবুদ্ধি আমরা,—সে যোগের মহিমা বুঝিব না। কেননা, তাহাতে পার্থিব উন্নতির তো কোন লক্ষণই পরিলক্ষিত হয় না? ধন মান পদ প্রভুত্ব—এ সব তো কিছুই আসিয়া জুটে না,—বাড়ার ভাগে 'বিদুরের ক্ষুদ' যাহা থাকে,—ছেঁড়া কাঁথা বা কৌপীন-কম্বলও যদি সঞ্চিত থাকে,—তাহাও হয়ত যাদুমন্ত্রে বিলুপ্ত হয়;—কেননা আসক্তি বা কামনা অথবা মমত্ববুদ্ধি—ওরূপ আধারে একবিন্দুও না থাকে, ইহাই যেন সেই নিত্য লীলাময়ের অনন্ত লীলার একটি উজ্জ্বল নিদর্শন।

তাই শ্যামের সংসারে—টাকা-আনা-পাইয়ের সুবিধা কখন হইল না। পার্থিব ভোগের স্বাদ তাঁহারা কখনই জানিলেন না। যেমন মন ও যেরূপ সংস্কার লইয়া তাঁহারা সংসার-রঙ্গালয়ে আসিয়াছিলেন, তাহাই সাধিয়া যাইতে লাগিলেন।

তাহাতে বিপুল আনন্দ ও পরম সন্তোষ ;—ক্ষোভ, লোভ বা আকাঙ্ক্ষার উত্তাপে মুহূর্ত্তের জন্যও তাপস-প্রবরকে বিচলিত হইতে হয় নাই। ওরূপ চিন্তাও কখন তাঁহার মনে জাগে নাই। বরং 'অর্থম্ অনর্থম্' ইতিকথিত মহাপুরুষ-রচিত পুণ্যশ্লোকটি তিনি মনের মধ্যে জপমালা করিয়া রাখিয়া-ছিলেন। দেহরক্ষার জন্য যেটুকু প্রয়োজন, অবশ্য তাহা চাই চটে, কিন্তু তদতিরিক্ত কিঞ্চি-ন্মাত্র সঞ্চয়ও তিনি অবৈধ মনে করিতেন। তাহাতে, হয়—একজনকে বঞ্চিত করা হইল, নয়—কাউকে কোন-না-কোন কৌশলে ঠকানো হইল, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। তাই সহধর্ম্মিণীকে শিক্ষা দিবার জন্য তিনি সময় সময় বলি-তেন,—"ক্ষুধার অন্ন আর তৃষ্ণার জল—এই টুকুই ভগবানের দান জানিও ; তা ছাড়া আর যে কিছু ভোগৈশ্বর্য্য, বিলাস বা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উপাদান, তাহা সয়তানেই জুটাইয়া দিয়া থাকে।"

কি গভীর শিক্ষা! অর্থে বীতস্পৃহ, ত্যাগী, ভগবদ্ভক্ত মহাত্মা ভিন্ন এমন শিক্ষা আর কে দিতে পারে? এই ঘোর ভোগবিলাসিতার কালে, কামিনী-কাঞ্চনের এই পূর্ণ আধিপত্য সময়ে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার এই ভীষণ সন্ধিস্থলে—যে মহাপুরুষ এই মহতী শিক্ষা দেন, তাঁহাকে আমি পূজা করি। আমার আরাধ্য, আদর্শ, পুরুষপ্রধান শ্যাম,—তুমিও একদিন ভক্তগৃহীর নিকট ইষ্টদেবতারূপে পূজা পাইবে।

শ্যামের সেই দেব-উদ্যান হইতেই শ্যামের সংসারধর্ম্ম পালন হয়। সে উদ্যানের এক অংশে নানাবিধ শাক-শব্জী ও তরি-তরকারী;—যে কালের যা, পর্য্যাপ্ত পরিমাণে তাহা ফলে। এক অংশে শ্রেণীবদ্ধ নারিকেল বৃক্ষ; তাহার সকল গুলিই ফলন্ত। আর এক অংশে আম জাম কাঁঠাল নীচু বেল কুল প্রভৃতি নানাজাতীয় গাছ, তাহাও যথাকালে ফলপূর্ণ হয়। নানা শ্রেণীর কদলীবৃক্ষের

সারি ;—মাটী ও সারের গুণে তাহাও অপরিযাপ্ত ফলে। আর ঐ সমস্ত বৃক্ষের চতুষ্পার্শ বেড়িয়া— সারিগাঁথা সুন্দর সুদৃশ্য সুপারিগাছ ;—ফলও দিতেছে, বাহারও খেলাইতেছে, বেড়ার কার্জও করিতেছে।

এই এত গাছ-পালা,—এত রকমারী কারখানা, কিন্তু বাগান যে খুব বড়, তাহাও নয়। ওরি মধ্যে কেমন একটু বন্দোবস্ত করিয়া এ গুলি রোপিত হইয়াছে যে,খুব বড় বাগানেও তত ফল ফলে না। অথচ কোনস্থানে একটু আবর্জ্জনা নাই, কোথাও একটু ময়লা নাই, কাহারো ডাল কাহারো গায়ে আসিয়া পড়িতেছে না,—সব সাফ্ পরিষ্কার,—তক্ তক্ ঝক্ ঝক্ করিতেছে। প্রত্যেক গাছের গোড়াগুলি খুসিয়া দেওয়া,—অন্য আগাছা দূরের কথা,—একটি দূর্ব্বাও তথায় গজাইতে পারে না। ডালগুলি সব ছাটা-ছেটা, কোনটি বা কেয়ারি করা,—যেন সদাই হাসিতেছে। গলিতপত্র বৃক্ষতলে পড়িয়া আদৌ

জমিতে পায় না,—যেমন পড়া, অমনি তুলিয়া ফেলা। সকাল-সন্ধ্যায় বাগানটিতে ঝাঁট পড়ে, যে সময় যে গাছের গোড়ায় জল দিবার দরকার, তাহা দেওয়া হয়; যে গাছটি একেবারে কাটিয়া উপ্‌ড়িয়া ফেলার প্রয়োজন হয়, তাহা সঙ্গে সঙ্গেই হইয়া থাকে। বাগানটিতে যেন লক্ষ্মীশ্রী বিরাজ-মানা,—তাহা যেন সদাই হাসিতেছে। এই বাগানের আয়েই নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হয়। তাঁহার ইষ্টদেবতা শ্যামের দৈনন্দিন ভোগ হয়। অতিথি-অভ্যাগত এবং দীনদুঃখীর সেবাও হইয়া থাকে।

সেই ফলমূলপূর্ণ উর্ব্বর উদ্যান,—তাহার ঠিক্ মধ্যস্থলের একখণ্ড জমিতে সুন্দর সুদৃশ্য মনোহর পুষ্পবাগিচা। এখানে কেবল মাত্র ফুলের গাছ। দেবসেবায় যে ফুল ব্যবহৃত হয়, কেবলমাত্র সেই সেই পুষ্পবৃক্ষ। বেল, মল্লিকা, যূঁই,—গোলাপ, গন্ধরাজ,শেফালিকা,—কৃষ্ণকালী, করবীর, চম্পক—

অতি পরিপাটী করিয়া রোপিত। রক্তজবা, নীলী অপরাজিতা, বক প্রভৃতি যন্ত্র-পুষ্পবৃক্ষও যথারীতি সজ্জিত। একস্থলে খুব বড় একটি বেদীর উপর যত্নসহকারে অনেকগুলি তুলসী বৃক্ষ;—যেন ভক্তের চিরসেব্য—নারায়ণের পরমপ্রিয় তুলসী-কানন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে সুদৃশ্য মঞ্চের উপর এবং চারি কোণে চারিটি বড় মঞ্চের উপরও ঐ পবিত্র বৃক্ষ রোপিত; যেন ভক্তকর্তৃক ইঙ্গিতে সেই নিত্য-নিরঞ্জনের নীরব আবাহন হইতেছে।

মালঞ্চের মধুর শোভা ইহাপেক্ষা অন্যত্র অনেক অধিক আছে, অনেকে তাহা দেখিয়াও থাকিবেন। কিন্তু ভক্তের এই স্বহস্তনির্ম্মিত, সযত্নবর্দ্ধিত মনোরম মালঞ্চ সন্দর্শন-সম্ভোগের সৌভাগ্য সকলের ঘটে না। সত্যই এ দেব-উদ্যান, অথবা দেবতারা এখানে নির্জ্জনবিহার করেন। সমগ্র স্থান ব্যাপিয়া এমন একটি মধুর মনোহর পদ্মগন্ধ নির্গত হয় যে, তাহা কেবল অনুভবনীয়। রাশি

রাশি ফুল ফুটিয়া দিক্ আলোকিত ও আমোদিত করিতেছে; সদ্গন্ধে চারিদিক্ পরিপূর্ণ হইয়াছে; কিন্তু মধ্যে মধ্যে ঐ স্বর্গীয় সৌরভ আসে কোথা হইতে? সকল ফুলের সমষ্টিতে কি ঐ পবিত্র গন্ধ উদ্ভূত হয়? না, তাতো নয়? পার্থিব কোন পুষ্পের গন্ধ তো এমন হয় না? বোধ হয় ত্রিদিবের পারি-জাতমাল্য দেব-কণ্ঠে বিলম্বিত থাকিয়া এই স্বর্গীয় সৌরভ বিতরণ করিতেছে। চর্ম্মচক্ষে দেবদর্শন হয় না, কিন্তু ভাগ্যে থাকিলে, দেব-বিভূতির অনুভূতি হয়। বিশেষ ভক্তের পক্ষে সকলই সম্ভব।

প্রকৃতই শ্যামের সেই মনোরম উদ্যান মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে মনে কেমন একটি পবিত্রভাবের উদ্রেক হয়,—হৃদয় কি এক অলক্ষ্যশক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে গা একটু ছম্ ছম্ করে; একটু ভয় ও ভক্তি আপনা হইতে আসিয়া থাকে। তাই পল্লীর ইতরসাধারণের সংস্কার—শ্যামের এ বাগানে ব্রহ্মদৈত্য আছে। ইহাতে আর কিছু না

তপোবন, এই সংসারই আমার স্বর্গ!" তমালিনী মনে করিলেন, "এমন দুই সোনারচাঁদ যার আছে, তার কিসের অভাব?"

মমতার অমৃতধারায় নিষিক্ত হইতে হইতে জনকজননী মায়ামন্ত্রে আত্মবিস্মৃত হইলেন। হায় মায়া, হায় গৃহ-সুখ!

কিন্তু এ সুখেরও সমাপ্তি আছে, এ সোনার স্বপ্নও ভাঙ্গিয়া যায়। তখন সংসার নীরস, কর্কশ, কঠিন হইয়া রুদ্রমূর্ত্তিতে ভয় ও বিভীষিকা দেখাইতে থাকে। তাহা স্মরণ করিলেও বুক শুকাইয়া যায়।

কিন্তু থাক্, এ অনাবিল স্বর্গীয় সুখের মাঝে সে দুঃখের ছবি এবার আর আমি আঁকিব না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শ্যাম স্মিতমুখে সাদর আহ্বান করিলেন, ধ্রুবতারা অনুরাগে উৎফুল্ল হইয়া তাঁহার কাছে গেল,—পিতার কোল ঘেঁসিয়া দুই পাশে দুই জনে বসিল। ধ্রুব কি ভাবিয়া, স্নেহভরে পিতার দক্ষিণ-হস্ত ধারণ করিয়া, উচ্চ হাসির লহর তুলিয়া, তাহার দিদীকে শুনাইয়া বলিল, "আমাল বাবা!"

তারাও হটিবার পাত্রী নয়, ধ্রুবের সে অন্যায় আব্‌দরে বাধা দিয়া, পিতার বামহস্তখানি ধরিয়া, সেই স্বরে কহিল, "না, আমার বাবা!"

ধ্রুব।—আমাল বাবা।

তারা। আমার বাবা।

মেয়ে-ছেলে তারা, স্বভাবত তাহার অভিমানই কিছু অধিক ; এবার সে বেশী দরদ জানাইয়া, একটু কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, "হ্যাঁ বাবা, তুমি—আমার বাবা নও ?—আমাকে তুমি ভালবাস না ?"

"হ্যাঁ মা, বাসি বৈ কি ?—তুমি যে আমার নয়নতারা !"—বলিয়া শ্যাম পরমস্নেহে কন্যাকে কোলে তুলিয়া লইলেন, তাহার সেই কচি কোমল কমনীয় মুখে একটি চুমা খাইলেন।

ধ্রুব দেখিল, তাহার দিদী আজ কাঁদিয়া জিতিয়া গেল,—পিতৃস্নেহ একাধিপত্য করিয়া লইয়া বসিল।

তবুও ধ্রুব দুষ্টুমি ছাড়িল না, সেইরূপ হাসিতে হাসিতে পিতাকে শুনাইয়া বলিল, "তালা তোমার নয়ন-তালা, আল আমি ?"

"তুমি আমার ধ্রুব-তারা !"—বলিয়া শ্যাম অপত্যস্নেহে অভিভূত হইয়া ধ্রুবকেও কোলে তুলিয়া লইলেন, ঘন ঘন তাহার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন।

জলসেক কার্য্য সমাপ্ত করিয়া তমালিনী আসিয়া সেই পবিত্র মিলন-মঞ্চে দাঁড়াইলেন। স্নেহে তাঁহার হৃদয় আর্দ্র, দেহ রোমাঞ্চিত,—সস্মিত বদনে, অনিমেষ নয়নে তিনি সেই শোভা দেখিতে লাগিলেন,—মুখে কোন কথা বলিতে পারিলেন না।

মাতাকে সম্মুখে দেখিয়া, ধ্রুব কি ভাবিয়া পিতার কোল হইতে উঠিল, এবং ক্ষুদ্র দুই কনক-কর প্রসারিত করিয়া মার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। স্নেহময়ী জননী প্রগাঢ় স্নেহে পুত্রের মুখচুম্বন করিলেন।

দুষ্ট ধ্রুব এ অপরাজিত স্নেহ-নীড় সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া তাহার দিদীকে 'দ্দূয়ো' দিবার অভিপ্রায়ে কহিল, "কেমন তালা, এবাল ?"

পিতা তাহার মনের ভাব বুঝিয়া, হাসিয়া, তাহার স্বরেই কহিলেন, "এবাল—কি ?"

"এবাল আমাল মার কোলে আর তালাকে উঠ্‌তে হয় না।"

"বটে!"—শ্যাম ঈষৎ হাসিয়া পত্নীর পানে চাহিলেন, তমালিনীও নীরব হাসি হাসিয়া ধ্রুবের চাঁদমুখে আর একটি চুমা খাইলেন।

ধ্রুব তখন অকুতোভয় হইয়া আবার বলিল, "কেমন ভালা, আল আমাল সঙ্গে লাগ্‌বে?"

বেগতিক বুঝিয়া তারা আর কোন উত্তর দিল না,—একবার মার মুখের পানে চাহিয়া, পরক্ষণে পিতার স্নেহময় বক্ষে মুখ লুকাইয়া, পিতার স্নেহপক্ষ-পাতিতা লাভের আশায়—ধীরে ধীরে পিতার গায়ে আপন কচি হাতখানি বুলাইতে লাগিল।

শ্যাম সহধর্ম্মিণীর পানে চাহিয়া আবার একটু হাসিলেন, তমালিনীও সে হাসির মর্ম্ম বুঝিয়া স্মিত-মুখে বলিলেন, "এখন কার জিত্‌ বলো?"

"তুমি বলো।"

"আমি তো এইমাত্র এখানে এসে দাঁড়ালেম, তোমার ছেলেমেয়ের স্নেহের কোন্দল—তুমিই তো এতক্ষণ দেখ্‌ছিলে।"

"শুধু দেখ্‌ছিলেম নয়,—উপভোগও কোচ্ছি-লেম।—কিন্তু ধ্রুব, এ তোমার বড় অন্যায় যে, তোমার দিদীকে 'তালা' বলো।"

ধ্রুব আবার হাসিয়া উঠিল। পিতার মুখেও 'তালা' কথা শুনিয়া, তাহার জয় হইল ভাবিয়া, বড় মধুর হাসির লহর তুলিল। কচি কচি শাদা দাঁত-গুলি বাহির হইয়া পড়িল,—বড় অপরূপ শোভা ধারণ করিল।

তারা কিন্তু এবার সুযোগ বুঝিয়া, তাহার অনেকক্ষণের আক্ষেপ—বিনাইয়া বিনাইয়া তাহার পিতার নিকট প্রকাশ করিল। সে বড়, ধ্রুব ছোট, অতএব ধ্রুব কেন তাহাকে দিদী বলিবে না, এই তাহার কাতর অনুযোগ। একবার নয়, দুবার নয়, —কিংবা একদিনও নয়, দুদিনও নয়,—ধ্রুব নিত্য তাহাকে 'তালা' বলিয়া ক্ষেপাইবে কেন,—এইটি সে বিশেষ করিয়া বাপকে জানাইল।

ধ্রুব কিন্তু বড় মজা পাইল। 'তালাকে' 'তালা'

বলিয়া আরো আমোদ পাইবে ভাবিয়া, একবার বাপের মুখের দিকে একটু দুষ্টুমির ভঙ্গিতে চাহিল; তারপর সেই দৃষ্টি বড় সরল মধুর শান্ত করিয়া, মার মুখের উপর মুখ রাখিয়া হাসি হাসি মুখে বলিল, "মা, ঐ তালা,—বাবাল কোলে উঠে ঐ দেখ কাঁচ্চে।"

ঠিক কান্না না কাঁদিলেও তারার মুখখানি কাঁদ-কাঁদ হইয়াছিল বটে; কেননা, এত অনুযোগ-উপরোধ সত্ত্বেও, ধ্রুব এখনো তাকে দিদী না বলিয়া 'তালা' বলিতেছে।—আর তার বাপ বা মা কেউ-ই এজন্য তাকে কিছু বলিতেছেন না।

তমালিনী তারার মনের ভাব বুঝিবেন। ধ্রুবকে একটু মধুর ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "ছি বাপ, দিদীকে কি 'তালা' বোল্‌তে আছে?—দিদী বলো।"

"তালা—দিদী?"

"হাঁ, দিদী!—তালা আর বোলো না।"

"তবে আয় তালা—না না, দিদি! ফুল তুলিলে চ।—আমায় ঐ আঙা ফুলতা দিতে হবে।"

শ্যাম বড় আদরে কন্যার পানে চাহিলেন, দেখিলেন, তারার সেই স্নেহময় বিষণ্ণ মুখে হাসি ফুটিয়াছে। সে পিতার কোল হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে মায়ের কাছ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল,—স্নেহভরে মায়ের আঁচল ধরিল। জননী তাহাকে স্নেহচুম্বনে প্রফুল্লিত করিলেন।

ধ্রুব মায়ের কোল হইতে নামিল। কচি-হাতে তারার হাত ধরিল। বড় মধুর হাসি হাসিয়া তারার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "দিদি, আল 'তালা' বোল্‌বো না,—একটা চু।"

তারা একেবারে আহ্লাদে গলিয়া গেল,—কেননা তার প্রাণের ভাই ধ্রুব—তাহাকে দিদী বলিয়া তার গালে চুমা খাইতে বলিতেছে।

ঘন ঘন মুখচুম্বনে ধ্রুবের সেই কচি মুখ লাল করিয়া, তারাও এবার ধ্রুবের হাত ধরিল। তাহাদের

সেই মধুরমিলনের স্বর্গীয় ছবি দেখিয়া, সুখীদম্পতী সজলনয়নে পরস্পরের পানে চাহিলেন।

তারা ধ্রুবের হাত ধরিয়া অদূরে ফুল তুলিতে চলিল। ক্ষুদ্র একটি সাজি সঙ্গে লইল। একহাতে ধ্রুবকে ধরিয়া—একহাতে সাজি লইয়া চলিল। শিশু ধ্রুব ঈষৎ টলিতে টলিতে, মাথা দোলাইতে দোলাইতে, থপ্ থপ্ করিয়া চলিল। —দিদীর সঙ্গে আজ তার বড় ভাব! মা বকিয়াছেন, —দিদীকে আর সে 'তালা' বলিবে না।

পতিপত্নী একদৃষ্টে উভয়কে দেখিতে লাগিলেন। শ্যাম ভাবিলেন, "অতি সুন্দর, অতি পবিত্র! কিন্তু ইহাপেক্ষাও পবিত্রতম ছবি আমার হৃদয়ে অঙ্কিত।" তমালিনী মনে মনে বলিলেন, "ভগবান্, এত সুখ অদৃষ্টে সহিবে তো?"

প্রকাশ্যে শ্যাম বলিলেন, "বলো দেখি, গার্হস্থ্য-জীবনে এর চেয়ে আর তৃপ্তি কি?"

উত্তরে তমালিনী বলিলেন, "এর পর আর যে কোন তৃপ্তি আছে, তা তো মনে হয় না।"

"হাঁ,হয় বৈকি ? একটু মনে কোরে দেখ দেখি ?"

"তবে তুমি বলো।"

"শ্যামের সেবা। সেই ত্রিভুবনসুন্দর—ত্রৈলোক্যসুন্দর ভগবানের মোহনরূপ ধ্যান।"

তমালিনী নীরব। স্বামীর মুখপানে চাহিয়া নীরবে একটি নিশ্বাস ফেলিলেন,—মুখখানি নত করিয়া রহিলেন।

স্ত্রীকে তদবস্থায় দেখিয়া শ্যাম কহিলেন, "কি, চুপ করিয়া রহিলে যে ? ভগবানের সেবা—তাঁর ধ্যান হোতে পূর্ণতৃপ্তি আর কিছুতে আছে কি ?"

সতী মনে মনে বলিলেন, "তা জানি না। তবে তোমার সেবা—তোমার শ্রীমূর্ত্তি ধ্যানে যদি ভগবানের পূজা হয়, তবে সে তৃপ্তিতে আমি বঞ্চিত নই।"

শ্যাম আবার বলিলেন,"পতি পুত্রের সম্বন্ধ

পার্থিব,—মায়িক মাত্র; ভগবানের সহিত যে সম্বন্ধ, তাহাই অপার্থিব,—অনন্তকাল স্থায়ী। আশীর্ব্বাদ করি, সেই চরমলক্ষ্যে তোমার মতি স্থির থাকিবে।”

এবার তমালিনী কথা কহিলেন। কনক করাঙ্গুলির একটি ন'খ খুঁটিতে খুঁটিতে ধীরভাবে স্বামীকে বলিলেন, “অজ্ঞান স্ত্রীলোক আমি,—শাস্ত্রের ও গূঢ় অর্থ কিছুই বুঝি না। তবে তোমার কৃপায় এইটুকু বুঝিয়াছি, তোমার কৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডের পতি, আর তুমি—আমার পতি।”

শ্যাম ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, “তবে কে বড় হইল, তুমিই বলো।”

তমালিনী পুনরায় একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “কে বড়, কে ছোট, তা জানি না। সে বিচার করিবার সামর্থ্যও আমার নাই। তবে তোমার চেয়ে বড় আমার আর কেহ নাই, কৃপা কোরে এ বিশ্বাস আমায় রাখিতে দাও।”

কিন্তু পরিত্রাতা শ্যাম——”

“পরিত্রাতা, মুক্তিদাতা, ইহকাল, পরকাল— সবই তুমি আমার। তোমার শ্রীমূর্ত্তির ভিতর দিয়াই আমি সেই ব্রহ্মাণ্ডপতিকে দর্শন করি।”

“হরিবোল হরি!”—শ্যাম ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, “হরিবোল হরি! এ ক্ষুদ্র আধারে—সেই বিরাট্ বিশ্বরূপ? মৃণ্ময় পাত্রে অয়স্কান্তমণি প্রতি-বিম্বিত হইবে?”

“ও সব অলঙ্কার-রূপক—আমি জানি না। জানি—তোমায়, জানি আমার ধ্রুব-তারায়, জানি এই সংসার-তপোবন। মহাগুরু—ইষ্টদেব! এই শিক্ষা দাও,—এ জীবনে যেন আর কিছু জানিতে না হয়।”

“কিন্তু, তাই কি?”

“তাই—এ-ই আমার স্বর্গ, এ-ই আমার বৈকুণ্ঠ, আর——”

“আর কি?—কি বলিতেছিলে বলো।”

সাধ্বী তমালিনী গললগ্নীকৃতবাসে—পরম ভক্তি-ভরে—স্বামীর পাদপদ্মে মাথা রাখিয়া বলিলেন, “আর এই আমার মোক্ষ।”

শ্যাম চমকিত হইলেন। সেই চমকিত অন্তরে বিদ্যুদ্বিকাশের মত একবার—কেবল একবার মাত্র যেন তিনি দেখিতে পাইলেন, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী—চতুর্ভুজ মুরারি—তাঁহার ইষ্টদেবতা শ্যাম—হাসি-হাসি মুখে তাঁহার সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর মস্তকে—তাঁহার অলক্ষ্যে—তাঁহার সেই যোগিজনদুর্লভ শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করিয়াই অন্তর্হিত হইলেন।

হরি হরি! এই কি সেই ভুবনমোহন শ্যাম-রূপ? এই রূপেই কি তিনি ভক্তের মন-প্রাণ হরণ করেন? সাধ্বী তমালিনী কি এতই ভাগ্যবতী?

শ্যামের সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। চোখ দিয়া প্রেমাশ্রুপাত হইতে লাগিল। ভয়-ভক্তি-বিস্ময়ে তিনি অভিভূত হইয়া পড়িলেন। মুখে আর বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না। নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ,

বিহ্বল হইয়া—তিনি পুণ্য-প্রতিমাকে দেখিতে লাগিলেন।

সাধ্বী তমালিনী চিরদিনই তাঁহার চক্ষে সুন্দর। আজ সে সৌন্দর্য্যের সহিত যেন আর একটু কি মিশিল। মুখ ফুটিয়া সে কথা তিনি প্রকাশ করিতে পারিলেন না,—অন্তরের অন্তরে তাহা অনুভব করিয়া কৃতকৃতার্থ ও ধন্য হইলেন।

সাজি ভরিয়া ফুল তুলিয়া ধ্রুব-তারা ফিরিয়া আসিল। সেই ফুলদল পিতাকে দেখাইয়া আমোদ করিতে লাগিল। তমালিনী সেই অবসরে স্বতন্ত্র একটি বড় সাজি লইয়া দেবপূজার জন্য পুষ্প-চয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। পট্টবাসপরিধানা, পবিত্র-রূপশ্রীসম্পন্না, তপস্বিনী মূর্ত্তিতে তিনি ফুল তুলিতে লাগিলেন। মুখে দিব্য জ্যোতিঃ, চোখে করুণা-দ্যুতি, হৃদয়ে উচ্চ আশা।

সতী সযত্নে দুই ছড়া মালা গাঁথিলেন। অতি পরিপাটী করিয়া, ভক্তিভরে দুই ছড়া বড় মালা

গাঁথিলেন। তৎসঙ্গে ছোট ছোট দুই ছড়াও গাঁথিয়া রাখিলেন। সাজিভরা মালা চারি গাছি একটি উচ্চ মঞ্চে রাখিয়া দিলেন।

তার পর ধ্রুবতারাকে তাহাদের সেই ক্ষুদ্র সাজিভরা ফুলে সাজাইয়া দিলেন। সেই সাজি তাহাদেরই জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। তাহারা নিজে জেদ করিয়া ফুল তুলিয়া আনিত বটে, কিন্তু জননীই প্রতিদিন তাহাদিগকে সাজাইতেন। আজিও সাজাইলেন। স্নেহময়ী মায়ের পদ্মহস্তের ফুলসাজ পরিয়া, স্বভাবসুন্দর ধ্রুব-তারা, যেন মুনিবালকবালিকাবেশে শোভিত হইতে লাগিল। ফুলের গহনা পরিয়া যখন তারা দুটিতে হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইল, তখন শ্যাম অদূরে—শ্যামের ভোগের জন্য কিছু ফলমূল সংগ্রহ করিতেছিলেন,—সেই ফলমূল লইয়া ফিরিয়া আসিলেন,—মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া দেখিলেন, তাঁহার প্রাণারাধ্য শ্যামেরই আর এক শ্রীমূর্ত্তি—যেন তাঁহার এই মুনিজনমনোহর মধুর

বালকবালিকার রূপে মিশিয়া—অতি অপরূপ ভঙ্গিতে সেই তপোবন আলোকিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে! তাহাদের রূপে দিক্ আলোকিত, আর সেই পুণ্য-তপোবন প্রফুল্লিত হইয়াছে।

ভক্ত তখন সেই সংগৃহীত ফলমূল একস্থানে সংরক্ষিত করিয়া, ভাববিভোর প্রাণে গুন্ গুন্ তানে গান ধরিলেন—

"শ্যামসুন্দর, রূপ মনোহর, প্রেম সায়র, প্রেমিক হে।"

এই একছত্র আবৃত্তি করিয়া যেন তাঁহার হুঁস হইল, এ লোকালয়,—আর তাঁহারই দুই বালক-বালিকা, ও বালকবালিকার রত্নগর্ভা জননী—তমালিনীও সেখানে সমুপস্থিত।—হয়ত আর কেউ কোথা হইতে আসিয়া দেখিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিবে,—তাই আজ যেন তাঁর একটু বাধ-বাধ ঠেকিল। কিন্তু 'লজ্জা-মান-ভয়'—এ তিন থাকিতে তো ও-জিনিষ মিলিবার নয়?—তাই সে স্বর্গীয় ভাবটিও সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হইল,—ধ্রুব-তারাকে

আদর করিয়া তিনি বলিলেন,—"ভাই-বোনে মিলে সেই গানটি গাও দেখি, আমি শুনি।"

বালক বালিকা সুমধুর আধভাষে গান ধরিল। হাতে তালি দিয়া, কীর্ত্তনের ভাঙ্গাসুরে, একটু নৃত্যের ভঙ্গিতে, গান ধরিল। সব কথা মুখে সুস্পষ্ট উচ্চারিত হইল না,—স-য়ে ব-য়ে, ম'-য়ে হ'-য়ে একটু উলট-পালট, একটু ছুট ছাড় হইল,—ছন্দে যতিপাত এবং সর্ব্বত্রই প্রায় তালভঙ্গদোষ ঘটিল, তথাপি সে সরল স্বর্গীয় ভাবোচ্ছ্বাসে, সেই সুন্দর শিশুকণ্ঠে যেন সুধাবৃষ্টি হইতে লাগিল। বিশেষ সেই স্থান, সেই সময়, সেই সহৃদয় শ্রোতা। বালিকা তারাই গানটি প্রায় সব গাইল,—ধ্রুব তার দিদীকে ঘিরিয়া, সুমিষ্ট আধভাষে, তালে বেতালে আখর দিয়া চলিল,—কখন বা ভাই বোন হাত-ধরাধরি করিয়া মধুর ভঙ্গিতে নাচিতে নাচিতে সম্মুখস্থ একটি তরুতল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল। অঙ্গে সেই মনোহর ফুল-সাজ,—মাতৃদত্ত প্রাকৃতিক ভূষণ।

সে ভূষণে সে সময় তাহাদিগকে সত্য সত্যই মুনি-বালকবালিকা বলিয়া বোধ হইল।

তারা গাহিল,—

"শ্যাম সুন্দর, রূপ মনোহর, প্রেম-সায়র, প্রেমিক হে।
বৃন্দাবন ধন, যশোদা-জীবন, রাধিকা-রমণ, রসিক হে॥"

ধ্রুব সুমধুর আধভাষে, সুধাকণ্ঠে আখর দিল,—

(ওহে নতবল হে, বংশীধারী বনমালী, নতবল হে।)

তারা,—

"ত্রিভঙ্গিম ঠাম, আহা কি সুঠাম, বনমালা গলে দুলিছে রে।
পীতধড়া পরা, বাঁকা শিখিচূড়া, বাঁশী-মুখে যেন নাচিছে রে॥"

ধ্রুব,—

(নাচ দেখে মোল লিদয় নাচে, এম্‌নি কোলে আপনি নাচে,
তালে বোল্‌তে হয় না—অম্‌নি নাচে)

তারা,—

"কি দেখিব আমি, ওহে অন্তর্যামী,
ঐ হাসি বাঁশী—কি রাঙা পা দু'খানি,
বুঝিতে না পারি, কি রেখে কি হেরি,
বহে আঁখি-বারি—হরি হে॥"

ধ্রুব,—

(দেখ চেয়ে হোলিহে,তোমার রূপ দেখে আমি মোলি হে,
তোমার হাসি-বাঁশী ভাল,—কি ঐ আড়া পা মঙ্গল,
বোলে দাও মোলে হোলিহে।)

শিশুকণ্ঠে প্রেম-ভক্তির মন্দাকিনী-ধারা বহিতে লাগিল। তাহাদের সেই মধুর নৃত্যে সমগ্র উদ্যানটিও যেন নাচিতে লাগিল। রোমাঞ্চিতকলেবর শ্যাম, প্রেমাশ্রুপূর্ণ নেত্রে, বৃন্দাবনের ছবি দেখিতে লাগিলেন। সাধ্বী তমালিনী সর্ব্বত্রই যেন পতির রূপ—তাঁহারই আর এক মূর্ত্তির বিকাশ দেখিয়া ভাবে আর্দ্র হইয়া পড়িলেন। পতিপত্নীর চারিচক্ষের মিলন হইল। নীরব ভাষায় উভয়ে উভয়কে প্রাণের সম্ভাষণ করিলেন। ধ্রুব-তারা মুনিবালকবালিকারূপে মাঝে আসিয়া দাঁড়াইল।

আবার আমার চোখে সেই ত্রিদিবের শোভা জাগিতেছে। সেই তমাল-তরু, সেই স্বর্ণ লতিকা,

ও সেই দুই হিরণ্ময়-ফুল—মনোহর দেবমূর্ত্তিতে আমার চোখের সাম্‌নে ভাসিতেছে। হায়! এমনটি কি আর দেখিব?

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। শ্যামের আরতি-কাল উপস্থিত। স্বয়ং ভক্ত শ্যামই শ্যাম-সুন্দরের সেই আরতি করিতেছেন। তন্ময় ও তদ্গতচিত্ত হইয়া, বাহ্যজগৎ ভুলিয়া, ভগবানের সেই মধুর অর্চ্চনা করিতেছেন। সুগন্ধ তৈলে সুরভিত,—বৃহৎ পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়া, ব্রজের ভাব ভাবিতে ভাবিতে—সেই ভাবে বিভোর হইয়া, তিনি শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিতেছেন। মুখখানি হাসিমাখা, আঁখি দুটি ঢুলু ঢুলু, সর্ব্বাঙ্গে ভক্তির পুলক,—যেন কি একটা ভাবের নেশা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে।

ব্রাহ্মণ দরিদ্র বটে, কিন্তু শ্যামের পূজার্চ্চনা বা বেশভূষাদি দারিদ্র্যব্যঞ্জক নয়। দিব্য একটি অষ্টধাতুনির্ম্মিত কারুকার্য্যখচিত উজ্জ্বল সিংহাসন, সেই সিংহাসনে রাধাশ্যামের যুগলমূর্ত্তি বিরাজিত। রাধার রাজরাণী বেশ; শ্যামের কিন্তু পীতধড়া রাখাল বেশ। এই বেশেই সেই রাখালরাজকে বড় সুন্দর দেখাইত। দূর দূরান্তর হইতে লোক—তাঁহার এই মোহনবেশ দেখিতে আসিত। ভক্ত শ্যামও এই বেশেই প্রতিদিন তাঁর ইষ্টদেবতার পূজার্চ্চনা ও ধ্যানধারণা করিতেন। আজও সেই নবীন নটবর বংশীধারী—শ্রীরাসরাসেশ্বর রাখাল-রাজের শ্রীমূর্ত্তি অর্চ্চনা করিতে করিতে তিনি আরতি করিতেছেন।

সে শ্রীমূর্ত্তির শোভা স্বভাবতই অতি সুন্দর ও মনোহর, তার উপর সাধ্বী তমাম্বিনীর সেই সযত্ন-রচিত পবিত্র পুষ্পমাল্যে সেই দেব-বিগ্রহ এমন অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত হইয়াছে যে, তাহা

দেখিলে চোখে জল রাখা যায় না,—অতি-বড় পাষণ্ডের চোখ দিয়াও সে সময় দুই ফোঁটা প্রেমাশ্রু পতিত হয়। সেই ভক্তিপূর্ণ মাল্য-চন্দন পরিয়া দেবতা হাসিতেছেন,—সে হাসিতে দশদিক অপূর্ব্ব প্রভায় উদ্ভাসিত হইতেছে,—ভক্তের মানস-দর্পণেও সে হাসির ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে। তাই ভক্তি-মতী তমালিনী নিবিষ্টচিত্তে স্বামীর সেই ইষ্টপূজা দেখিতে দেখিতে, এক একবার কেমন হইয়া যাইতেছেন। তাঁহার সেই পট্টবাসপরিধানা, অপূর্ব্ব পবিত্রশ্রীসম্পন্না দেবীমূর্ত্তি—সে সময় অতি সুন্দর দেখাইতেছে। সেই সৌন্দর্য্যময়ী মূর্ত্তিতে, তিনি সেই দেবগৃহে বসিয়া মধ্যে মধ্যে সুগন্ধিপূর্ণ ধূপ-ধুনা-গুগ্‌গুল অগ্নিস্পৃষ্ট করিতেছেন। সে সদ্গন্ধ দেবগৃহ ছাড়িয়া বহুদূর বিস্তৃত হইল,—তাহাতে সেই সমস্ত স্থান সুরভিত, আমোদিত ও পুলকিত হইয়া উঠিল।

এমনি মধুরভাবে বহুক্ষণ ধরিয়া শ্যামের আরতি

চলিল। ভক্তের প্রিয়সন্তান ধ্রুবতারাও তখন পিতার সে দেবকার্য্যে সহায়তা করিতেছিল। তাহারা ঠাকুরের উভয় পার্শ্বে অচঞ্চল ধীরভাবে দাঁড়াইয়া সাবধানে চামরব্যজন করিতেছিল।

আরতি সমাপনান্তে, জলপানাদি নিবেদনের পর স্তব ও প্রার্থনা চলিল।

বিশুদ্ধ সংস্কৃত শ্লোকে সে প্রার্থনা ও স্তব বিরচিত ;—শ্যামের ন্যায় সাত্বিক সুব্রাহ্মণের মুখেই তাহা শোভা পায়।

পিতার নিদেশানুসারে সেই স্তবের অনুকরণ করিয়া, ধ্রুবতারাও জয়দেবের মধুর পদাবলী আবৃত্তি করিতে লাগিল। ভক্তের ভগবান্ যেন প্রসন্নমনে তাহা শুনিলেন। 'ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন' এই বিশ্বাসে ভক্ত শ্যাম—শিশু পুত্রকন্যাকেও এই সব সাধন-সঙ্গীত শিখাইয়া দিতেন ;—তাহাতে তিনি নির্ম্মল আনন্দের সহিত পরমা শান্তি লাভ করিতেন। তাঁহার পুরী সদাই পবিত্র ও পুলকিত থাকিত। শ্যাম

পত্নীকেও একটু একটু সংস্কৃত শিখাইয়াছিলেন। পুণ্যবতী তমালিনীও এক এক দিন নির্জ্জনে, গুন্ গুন্ তানে হরিগুণ গান করিতেন,—প্রাণের ধ্রুব-তারাকেও তাহা শিখাইয়া, অতি শৈশব হইতেই তাহাদের হৃদয়ে ধর্ম্মের মধুর মোহনছবি জাগাইয়া রাখিয়াছেন। তাহারই ফলে, সে সংসারের আদ্যন্ত ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত। আহার বিহার হইতে পূজার্চ্চনা পাঠ পর্য্যন্ত—সকল বিষয়েই ধর্ম্মের অনুশাসন ছিল। সেই অনুশাসনের গুণে, সে সংসার—সোনার সংসার হইয়াছিল! সোনার সংসার, ধর্ম্মের সংসার, দেবতার সংসার, অথবা সংসার-তপোবন—যে নামে ইচ্ছা, তাহাকে অভিহিত করা যায়।

বর্ত্তমানে আমাদের এই আদর্শই গ্রহণ করিতে হইবে, নচেৎ উপায় নাই, রক্ষা নাই। বাহ্য-আড়ম্বরে মাতিয়া, ঝুটা চাকচিক্যে ভুলিয়া, আমরা অন্তঃসারহীন, অসার, মনুষ্যত্ববর্জ্জিত হইয়া

পড়িতেছি, ধর্ম্মের সেবায় আত্মার পরিপুষ্টি ভিন্ন আমাদের আর গত্যন্তর নাই। তাই এই নিতান্ত সামান্য ও সাধারণ আখ্যায়িকাটি লইয়া আমি পাঠকসমাজে উপস্থিত। চটকচমকপ্রদ ঘটনা আনিয়া, ইন্দ্রিয়সুখসর্ব্বস্ব বিলাসী নায়কনায়িকাকে মিলন-বিচ্ছেদের ফাঁদে ফেলিয়া,—পাঠকের কৌতূহলবৃত্তি উদ্দীপ্ত করিতে আর প্রবৃত্তি হয় না। সময় হইয়াছে, দিনও ফুরাইয়া আসিতেছে,—এখন একটু হরিনাম শুনিতে ও শুনাইতে ইচ্ছা হয়।

শুনি নাকি, শ্রীবৃন্দাবনধামে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনমন্দিরে, সেই দেবলীলা, এখনো সমানে হয়। কৃষ্ণের বাঁশী এখনো তেমনি বাজে। ভাবের কান লাভ করিলেই নাকি তাহা শুনা যায়। তবে, হে ভাবরূপী ভগবান্! এস, একবার এ হৃদয়ে ব'স, আমি তোমায় দেখি। তেমনি বিনোদঠামে, ব্রজাঙ্গনার মন ভুলাইয়া, শ্রীরাসমঞ্চে

যেমন বসিতে, সেইভাবে একবার ব'স দয়াময়! ব'সে সেই মোহন বাঁশীটি একবার বাজাও, আমি শুনি। 'বাঁশী বাজ্ দেখিরে'—বলিয়া ভক্ত যেমন তোমায় লইয়া মাতিয়াছিলেন, আমি তেমন পারিব না, তবে তোমায় প্রাণ পূরিয়া একবার দেখিব বড় সাধ। আজন্ম বৃথায় ঘুরিয়া মরিলাম,—কত জন্ম এ ভাবে কাটিয়াছে, হায়! তাই বা কে জানে,—যদি দয়া কোরে, পতিত বোলে, একবার দেখা দাও পতিতপাবন—এই ভরসা! বড় সাধে, বড় আশায়, শ্যামের সংসার আঁকিতেছি,—যদি সেই ভক্তের পুণ্যফলে—ভক্ত-পরিবারের আশীর্ব্বাদে, একবার তোমায় দেখা পাই জনার্দ্দন!

আরতি ও পূজাপাঠ অন্তে, ভক্ত শ্যাম সপরিবারে শ্যামের প্রসাদ পাইলেন। ক্রমে রাত্রি হইল। ধ্রুবতারা শয়ন করিল। বড় প্রফুল্লচিত্তে, বিরামদায়িনী গাঢ়নিদ্রায় তাহারা নিদ্রিত হইল।

গ্রীষ্মকাল, জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত। উন্মুক্ত গবাক্ষ-পথে চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে। সেই আলো, ঐ দুটি নিদ্রিত দেবশিশুর মুখে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। আকাশে ঐ একটি চাঁদ, আর এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ-গৃহে, মুক্ত শয্যাতলে নিদ্রিত—পাশাপাশি শায়িত—দুটি চাঁদ। মুখ দুখানি হাসিমাখা। যেন সেই হাসিমাখা মুখে পরস্পর পরস্পরকে কি বলাবলি করিতেছে। তেমন পবিত্রতা, তেমন সরলতাময় হাসিমুখ দেখিতে বড় সাধ যায়। বুঝি ঐরূপ পুণ্যছবিতেই ভগবান্ প্রত্যক্ষরূপে আছেন। তাই শিশুর রূপে এত আকর্ষণ।

গবাক্ষপথে মুখ রাখিয়া ভগবদ্ভক্ত শ্যাম গম্ভীর-ভাবে বসিয়া আছেন, পদতলে বসিয়া সাধ্বী তমালিনী তাঁহাকে ধীরভাবে ব্যজন করিতেছেন। স্বামীকে ব্যজন করিতে করিতে এক একবার আবেগভরে তিনি সেই নিদ্রিত—নাড়ী-ছেঁড়া ধন দুটিকে দেখিতে

লাগিলেন। জ্যোৎস্নার আলো গৃহে আসিয়া পড়িয়াছে, সেই আলোর সহিত এই পবিত্র আলোক মিশ্রিত হইয়া বড় অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে। স্নেহময়ী জননীর চক্ষে আজ সে শোভা অতুলনীয় হইল। মমতার অমৃত-আস্বাদে পরিতৃপ্ত ও পুলকপূর্ণ হইয়া স্বামীকে তিনি সেই স্বর্গের সুষমা দেখাইলেন। অতি মধুরস্বরে গদ্গদ কণ্ঠে কহিলেন, "ওগো দেখ একবার—এ ত্রিদিবের শোভা! তোমার ধ্যান, ধারণা, ঈশ্বরচিন্তা—সকলই আসিয়া এখানে মিশিয়াছে!"

সত্য ত্রিদিবের শোভা! শতচক্ষু বিস্তৃত করিয়া অনিমেষে তাহা দেখিলেও দর্শনপিপাসা মিটে না!

শ্যাম পশ্চাৎ ফিরিয়া একবার চাহিলেন, প্রেমে প্রাণ পূরিয়া উঠিল,—পবিত্র ছবি দর্শনমাত্র হৃদয় রোমাঞ্চিত হইল;—স্মিতমুখে আর্দ্রস্বরে তিনি বলিলেন, "শান্তি!"

মুখে ঐ একটি মাত্র ক্ষুদ্র শান্তিশব্দ উচ্চারণ

করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রাণের ভিতর প্রেমের পারাবার খেলিতে লাগিল ;—সেই মধুর জ্যোৎস্না-লোক মাধুর্য্যময়ী তমালিনীর মুখে আসিয়াও পড়িয়াছে ;—মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নির্ব্বাক্ হইয়া মুহূর্ত্তকাল সজলনয়নে তিনি সেই শোভার সমষ্টি দেখিতে লাগিলেন। মুখে আর দ্বিতীয় বাক্যস্ফুরিত হইল না।

পতিকে নীরব দেখিয়া তমালিনী পুনরায় বলিলেন, "আমি কি তোমার ঈশ্বরচিন্তার ব্যাঘাত করিলাম ?"

শ্যাম। না পতিব্রতে ! তা নয়। বিস্ময়বিহ্বল-চিত্তে চারিদিকেই আমি শান্তির ছবি দেখিতেছি। তুমি শান্তি, আমি শান্তি, আমার প্রাণাধিক ধ্রুবতারা শান্তি—সবই শান্তিময়। এ শান্তির মাঝে বিশ্বসংসার নিমগ্ন। সাধ যায়, এমনি মঙ্গল-মুহূর্ত্তে, মধুযামিনীর এই মধুর ছবির সঙ্গে আমার প্রাণারাধ্য শ্যামের সেই চিদ্‌ঘন নবনটবরবেশ প্রকটরূপে দেখিয়া মানবজন্ম সফল করি ! মনে

হয়, যদি সেই ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু রাঙ্গা-পায়ে নূপুর দিয়া, শ্রীমুখে মোহনবাঁশী বাজাইতে বাজাইতে, মধুর-ভঙ্গিতে নাচিতে নাচিতে একবার আবির্ভূত হন! আশায় প্রাণ নাচিতেছে, কাঁদিতেছে,—মনে হইতেছে,—শ্রীবৃন্দাবনধামে গিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা দর্শন করিলেই আমার এ সাধ মিটিবে।—প্রিয়তমে, কিছুদিনের জন্য তবে আমায় বিদায় দাও। ঐ মায়ার পুতলি দেখাইয়া, মায়ার বন্ধনে আর আমায় আবদ্ধ করিও না।

তমালিনী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। স্বামীর সব কথা শুনিলেন। তাঁহার মনের ভাব বুঝিলেন। একটু আক্ষেপভরে, অভিমানসহকারে বলিলেন,—"নিত্যলীলা দর্শন? রাধাকৃষ্ণের পূর্ণ-মিলন নিরীক্ষণ? কেন, গৃহে বসিয়া কি তা পাও না? এ তপোবনে কি সে স্বর্গীয় ছবি মিলে না? সত্যই কি নারীজাতিমাত্রেই মায়াবিনী,—যে, মায়ার ফাঁদ পাতিয়া বসিয়া আছে?"

সপ্রতিভ শ্যাম এবার একটু অপ্রতিভভাবে বলিলেন,"না শুভে, আমি সে কথা বলি নাই ; তবে মনে হয়, আকাশের ঐ শারদীয় চাঁদ,—আর গৃহে এই নিদ্রিত—জ্যোৎস্নালোকপ্রতিবিম্বিত—দুই সোনার চাঁদ দেখিতে দেখিতে—সৌন্দর্য্যের সীমা-বর্ত্তিনী জীবন্ত জাগ্রৎ চাঁদ তুমি তমালিনী,—এই অনুপম সৌন্দর্য্যসাগরে আমি ডুবিয়া যাই ! বিস্ময়ের কথা কিছুই নাই, তিলমাত্রও অহঙ্কার সাজে না,—গৃহী আমি, সংযমী বা সন্ন্যাসী নই !—আর তাহা হইলেই বা কি ? যাতে মুনিরও মন টলে, দেবতারও পদস্খলন হয়, তাতে বড়াই করিবে কে ? মোহ—মোহের ভয় বড় করি প্রিয়তমে ?"

ক্ষণকাল দুইজনে নীরব। শ্যামের চক্ষে দুইবিন্দু জল,—তমালিনীর অনিমেষ নয়নে স্বামীর সেই প্রেমাশ্রু দর্শন।

সহসা দৈববাণীর মত, শূন্যে কে এই অভয়দান করিল,—

"নারে না, তোর সে ভয় নেই রে, সে ভয় নেই——তুই যে বুড়ী ছুঁয়েছিস? ঈশ্বরকে ব-কল্‌মা দিয়ে তুই যে সংসার পেতেছিস?—তোর কি আর মার্‌ আছে?"

রোমাঞ্চিত কলেবরে, ভয়ভক্তিবিস্ময়সহকারে শ্যাম বলিয়া উঠিলেন,—"একি! কে তুমি?—আশার অমৃতময়ী বাণী শুনিয়ে আমার নিদ্রিত প্রাণ জাগরিত কোর্‌লে?—হায়! কে তুমি? তোমার কি রূপ? একবার দেখা দাও, আর একটি-বার কথা কও,—চর্ম্মচক্ষে কি তোমায় দেখ্‌তে পাবো না? অহো ভাগ্য!"

আবার সেই অমিয়স্বর সেইরূপ অলক্ষ্যে ধ্বনিত হইল,—"তুই ঘরে বোসে হরিনাম কর্‌,—তোর সব সাধ মিটবে?"

শ্যামের সর্ব্বাঙ্গ স্পন্দিত হইল, দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। ভাবাবেশে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে কহিলেন, "একি! স্বর যে আমার

পরিচিত! হায়, আমি যে চেন-চেন কোচ্চি?—দোহাই তোমার, তুমি যে হও,—একবার দেখা দাও!"

"কিন্তু ভাই, তুমি তো আমায় চাও না,—তোমার শ্যামকেই চাও?"

"তা চাই চাবো, এখন তোমায় চাই।"

"আমি যদি শ্যাম না হোয়ে রাম হই?"

"একি, আমি জাগ্রতে স্বপ্ন দেখ্‌চি নাকি?"—কণ্টকিতদেহে মনে মনে শ্যাম এই কথা বলিলেন মাত্র।

অন্তর্য্যামীর উত্তরের ন্যায় অমনি সেই অনন্ত শূন্য হইতে ধ্বনিত হইল,—"হাঁ, একরূপ স্বপ্ন বটে, তবে সোনার স্বপ্ন। ওরে, দেবস্বপ্ন স্বপ্ন নয় রে,—সত্য।"

"তুমি রাম? ভাল, ঐ রামরূপেই তবে তোমায় দেখ্‌ব।"

"আমি রাম, কৃষ্ণ—দুই-ই।"

"আরো ভাগ্যের কথা,—আমি একাধারে ঐ রামকৃষ্ণরূপেই তোমায় দেখে জন্ম সফল কোর্‌বো।"

"কিন্তু তাতে তো তোমার বিশ্বাস হবে না? আমি যে সামান্য নরবেশ ধোরেই ভক্তের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াই?—পতিতকেও কোল দিই।"

"পতিতকে কোল দাও?—তবে পতিতপাবন! দয়াময়! দীননাথ! এ দীনের প্রতি প্রসন্ন হও।"

"ভাগ্যবান্! ভক্তচূড়ামণি! তুমি দীন? তবে এ সংসারে ধনী কে? ভক্তের হৃদয়-ঐশ্বর্য্য চেয়ে—ঐশ্বর্য্য আর কার?"

সহসা সেই গৃহদ্বারের সম্মুখে আসিয়া নরোত্তম ভক্তবৎসল দাঁড়াইলেন। এবার আর সে পাগলের বেশ নয়,—শান্ত শুদ্ধ বুদ্ধরূপে তিনি আবির্ভূত, মুখখানি হাসিমাখা, সমাধিমগ্ন যোগচক্ষু, সর্ব্বাঙ্গে পুলক ও পদ্মগন্ধ।—গন্ধে চারিদিক্ আমোদিত হইয়াছে।

পতিপত্নী ভয়ভক্তিবিস্ময়ে আত্মহারা হইলেন,

—মুখে আর রা শব্দ ফুটিল না। উভয়ের জানু অবনত, হস্ত অঞ্জলিবদ্ধ, চক্ষু প্রেমাশ্রুপূর্ণ।

ধ্রুবতারা সহসা জাগিয়া উঠিল। কাহার মধুর আহ্বানে তাহাদের ঘুম ভাঙ্গিল। সে জাগরণে আর কাল-নিদ্রা আসিবে না। বিনা তপস্থায়, পিতৃপুণ্যে তারা তরিয়া গেল। হায়, ভক্তপরিবার! তোমাদের পদরেণুও যদি পাই?

কিছুক্ষণ সকলেই নীরব। ভক্ত ও ভগবানে যোগ হইতেছে। উভয়ে উভয়কে অপূর্ব্ব আকর্ষণে আকর্ষিত করিতেছেন। জ্যোৎস্নায় বিদ্যুদ্বিকাশের মত একটি অলৌকিক দিব্য জ্যোতিঃ তথায় প্রকাশ পাইতে লাগিল।

ভক্তবৎসল বলিলেন, "আমি আছি,—কোথাও যাই নাই। আর্ত্ত, কাঙ্গাল, অনাথ ভক্তের জন্য আমার প্রাণ বড় কাঁদে। আহা! তারা যে আমার শরণাগত! তাই নানারূপ ধোরে আমায় আস্‌তে হয়। আজ থেকে আমি তোমাতে বিশিষ্টরূপে

রোইলেম। তোমাতে আমি শক্তি সঞ্চার কোত্তে এসেছি। শক্তি দিলেম। আমার নাম নিয়ে যারা তোমার কাছে এসে কেঁদে পোড়্‌বে, তাদের উদ্ধার কোরো। বড় ছোট বাদ-বিচার কোরো না। দেখো, যেন অহংজ্ঞানে মাতিয়ে তোলে না। তা হোলেই পোড়ে যাবে। বলে—'পঞ্চভূতের ফাঁদ।' অতি সাবধান!"

শ্যাম ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া ভগবানের পদধূলি লইতে গেলেন। দেবমূর্ত্তি শূন্যে উঠিল।

পুরুষোত্তম কহিলেন, "সাধারণতঃ দেহীজনে এখন আর আমায় স্পর্শ কোর্‌তে পারে না। আবার যখন নরদেহ ধোরে তোমাদের ভিতর মিশ্‌বো, তখন যত ইচ্ছে পদধূলি নিও।—আর কি চাও বলো।"

"নারায়ণ, জনার্দ্দন, ভক্তবৎসল! অন্তর্য্যামী তুমি,—কি আর বোল্‌বো——"

শ্যামের মুখে এবার কথা ফুটিল। ভক্তের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া ভক্তবৎসল বলিলেন, "হাঁ নবনীরদবরণ নটবর শ্যামের মোহনরূপ দেখিতে তোমার বড় সাধ। তবে বৃন্দাবনের সেই ছবিটি একবার মনের মধ্যে ধ্যান করো। শ্যাম বোলে একবার ডাকো, কাঁদো,—রাধাশ্যামের প্রকটমূর্ত্তি এখানে বোসেই দেখ্‌তে পাবে। এই সংসারই তোমার বৃন্দাবন। আমার ঐ মা-ই— তোমায় ঠিক বোলেছেন, এই তপোবনে বোসেই তুমি সব পাবে। (তমালিনীর প্রতি) কেমন গো মা! তুমি কি চাও ?—শ্যাম না স্বামী ?"

"যদি স্বামীতেই সেই পূর্ণব্রহ্ম থাকেন, তবে তাঁহাকে আর নাই চাইলেম ?"—পতিদেবতা পুণ্যবতী অলৌকিক পতিভক্তিবলে—ভগবানের মুখের উপর জোর করিয়া এই কথা বলিলেন,— এতটুকুও দ্বিধাবোধ করিলেন না।

কল্পতরু সন্তুষ্ট হইয়া স্মিতমুখে ভক্তকে উদ্দেশ

করিয়া বলিলেন, "বুঝ্‌লেম, এই ব্রহ্মময়ী মার আমার অবিচলিত পতিভক্তিবলে,—জগতের পতিকে তুমি আয়ত্ত কোরেছ। তোমার সংসারধর্ম্মই সার্থক, তোমার গৃহাশ্রমই আদর্শ গৃহাশ্রম।—মা, তোমার আর কোন কামনা আছে?"

"আমার পতিকে অজেয় ও দৈবশক্তিসম্পন্ন করুন;—ঐ চরণতীর্থে যেন আমি মাথা রাখিয়া যাইতে পাই।"

"তথাস্তু।—আর তোমার পুত্রকন্যার?—তোমার নিজের?"

"কায়া থাকিলেই ছায়া থাকিবে—শিবশক্তি প্রভেদ করে সাধ্য কার?"

"শান্তিরূপেণ সংস্থিতা—মা, তুমিই সেই শান্তি! তোমার কৃপা-কটাক্ষে শত শত সংসার শান্তি-তপোবনে পরিণত হবে। তোমার পুত্রকন্যার শক্তি ও সৌভাগ্য দেখে, লোকে অবাক্ হোয়ে যাবে।"

জ্যোৎস্নায় জ্যোতির্ম্ময়ের জ্যোতি মিশিয়াছে, —দিবালোক কোন্ ছার! ধ্রুবতারা কিছুক্ষণ নির্ব্বাক্ রহিয়া পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে লাগিল।

এইবার তারা সাহসভরে কহিল, "ঠাকুর, তোমার ছবি দেখেছি, আজ তোমায় দেখ্‌লুম—এখন থেকে আমি তোমায় পূজা কোর্‌বো।"

"কোরো—মার মত শক্তিময়ী হোয়ো।"

"আল আমি তোমাল নামগান কোল্‌বো?"

"বটে?—আমার কি নাম বলো দেখি?"

"কেন?—লামকেষ্‌তো। ঘুমেল সময় কে আমালে বোলে গেছে,—'লামকেষ্‌তো-নাম গাওলে মনেল হলোষে'।"

"এঁ্যা! রামকৃষ্ণ-নাম তোমায় বোলে গেছে? —গুরু, পতিতপাবন, ভগবান্! স্বপ্নে শিশু হৃদয়েও তোমার আবির্ভাব?, আজ হোতে তবে আমিও ঐ ইষ্টমন্ত্র জপ কোর্‌বো।"—শ্যাম হর্ষোৎফুল্লহৃদয়ে এই কথা বলিয়া উঠিলেন।

উত্তরে পারের কাণ্ডারী কহিলেন, "উঁহুঁ, সেটি কিছুতে হবে না। তা কোরো না বাপু, তা কোরো না—সব গুলিয়ে যাবে! ওরে বাপ্! ভাবের ঘরে চুরি? তুমি যে জন্ম জন্ম শ্যামরূপ ধ্যান কোরেছ,—হরি হরি বোলে এসেছ?—এখন আবার অন্য নাম—অন্য রূপের ধারণা? না, উটি কিছুতে হবে না। তা হোলে এই তোমার শেষ, সব পণ্ড,—ভূতের বেগার খাটা সার!"

"প্রভু, কি অনুমতি কেচ্চেন? তবে অধীনের প্রতি কি আজ্ঞা হয়?"

"তুমি তোমার দয়ালশ্যামকে ভজনা করো, প্রাণ খুলে তাঁকে ডাকো,—এই মুহূর্ত্তেই তিনি তোমায় দেখা দিবেন,—আমি তাঁর প্রতিনিধি মাত্র।"

"তবে তাই,—প্রভুর অনুমতিই শিরোধার্য্য।"

সুকণ্ঠ শ্যাম—অতি সুস্বরে—সপ্তমে সুর চড়াইয়া—আকাশমেদিনী প্লাবিত করিয়া,—নিশীথের করুণ ঝঙ্কারে—বেহাগের উচ্চ তানে—একটি

গান ধরিলেন। গানটি কোন ভক্তের রচিত। গানের বর্ণে বর্ণে সেই নবনীরদবরণ—নবীননটবর শ্রীশ্যামসুন্দরের শ্রীমূর্ত্তি প্রকটিত হইয়া ভক্তের মন প্রাণ মোহিত করিয়া ফেলিল।

শ্যাম গাহিলেন ঃ—

"কবে হবে মম শুভদিন সমাগম।
নয়নে হেরিব শ্যাম নবঘন॥
যবে নাথ নাথ বলি, পড়িব গায়ে ঢুলি,
গাইব প্রাণ খুলি সরস প্রেম-গান॥
শারদ-পূর্ণিমা অদৃষ্ট-আকাশে,
উদয় হইবে মাতিব রাস-রসে,
যমুনা-পুলিনে, নিকুঞ্জ-কাননে,
হৃদি-বৃন্দাবনে বসিবে নারায়ণ॥
ভক্তি-কেশদামে মুছাব রাঙা চরণ,
হৃদি-বৃন্দাবনধামে বসিবে নারায়ণ॥"

গান গাহিতে গাইতে শ্যাম দেখিলেন, ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেই মধুর মনোহর শ্রীমূর্ত্তি ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইয়া,—তাঁহার প্রাণারাধ্য

চিন্ময় ইষ্টদেবতা—তাঁহারই চির-অভিলষিত বৃন্দা-বনেব সেই নবনীরদবরণ নবীননটবব শ্রীরাখাল-বেশে—ধড়া চূড়া পরিয়া, রাঙাপায়ে নূপুর দিয়া, শ্রীমুখে 'জয় রাধে' বলিয়া মোহনবাঁশীর আলাপ কবিতে করিতে—শ্রীরাধাসহ হাসি-হাসি মুখে তথায় আবির্ভূত হইলেন, এবং সেইখানেই ব্রজের মধুর ভাব—বৃন্দাবনের সেই নিত্যলীলা সম্যক্‌রূপে প্রকটিত হইতে লাগিল। সপরিবার-সন্তান—ভক্ত—জন্মজন্মের তপস্থায়—যুগলরূপদর্শনে জীবন্মুক্ত হইয়া—সেই অহেতুক আনন্দরস পান করিতে লাগিলেন,—আনন্দ-অমৃতরসপানে অমর হইয়া রহিলেন।

এস মন্মথ! শান্তির জন্য লালায়িত হইয়াছিলে,—শান্তির ছবি দেখিতে চাহিয়াছিলে, এস, প্রাণ ভরিয়া আজ সে দৃশ্য দেখিয়া লও! প্রেম ও শান্তি এই গৃহাশ্রমেই আছে,—এই সংসার-

তপোবনেই তাহা পরিদৃষ্ট হয়,—তবে বড় বিরল। জন্মান্তরে শ্যামের ভাগ্য লইয়া সতীলক্ষ্মী দেবী তমালিনীর ন্যায় ধর্ম্মপত্নী লাভ করিও, তোমার পিপাসা মিটিবে,—শত মোহিনী বা মায়াবিনী তোমায় কিছু করিতে পারিবে না। ইহজীবনের বাকা কটা দিন সেই পাগলরূপী পুরুষোত্তমকে ধ্যান করো, আর মনে মুখে সদাই বলো—

"জয় কাঙ্গালের ঠাকুর রামকৃষ্ণ !"

গ্রন্থ সমাপ্ত।